

বিশ্ব ফুটবল

চিরঞ্জীব

বিশ্ব ফুটবল



বিশ্ব ফুটবল

চিরঞ্জীব

জ্ঞানতীর্থ :: প্রকাশক
১নং বিধান সরণী, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ : ১৮ জুন ১৯৬৭ (ঐতিহাসিক ইডেন উদ্যানে ফুটবল খেলার উদ্বোধন দিবস)

প্রচ্ছদ শিল্পী : প্রণব শূর

প্রকাশিকা : ববিটা দাশ ১, বিধান সরণী কলিকাতা-বারো।
মুদ্রাকর : সুনীল কুমার রুদ্র, রুদ্র এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড (প্রিন্টিং সেক্‌সন্)
৩২, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা-ছয়।

দাম : তিন টাকা

ফুটবল

যাঁরা

ভালবাসেন............

BISWA FOOTBALL

BY CHIRANJIB

'ব্রেবোর্ণ থেকে ইডেনে' লিখেছিলাম অতি দ্রুত। ফুটবল সম্পর্কে লেখার ইচ্ছে তখন থেকেই। ভেবেছিলাম ধীরে সুস্থে লিখবো। 'বিশ্বফুটবলের' কলেবর বৃদ্ধি হবে। কিন্তু জ্ঞানতীর্থের কর্ণধার কানাইবাবুর দেরি সহ্য হল না। —তাড়াতাড়ি কপি চাই'—তাগাদার পর তাগাদা।

অনেক দিকপাল বিশ্বফুটবলের আসরে। কাকে রাখি, কাকে বাদ দিই সমস্যায় পড়লাম। চলে গেলাম—শ্রীমতী নন্দীর কাছে। বললেন, অমুক অমুককে নাও। কিন্তু তাঁর নির্দেশও পুরোটা কাজে লাগাতে পারিনি কারণ সময় বেশি ছিল না।

এদিকে শ্যামল কুমার চক্রবর্তী ও অপরাজিতা বিশ্বাসের ধমকানি,—বিশ্বকাপ শেষ হয়েছে একবছর হল, এখনও বই বেরুচ্ছে না কেন? কোমর বেঁধে ওঁরাও আমার কিছু কাজ নিজেদের কাঁধে তুলে নিলেন। এলেন রণজিৎ শিকদার। 'বিশ্বফুটবল' তাই অবশেষে বেরুলো।

কলিকাতা চিরঞ্জীব

১লা আষাঢ় ১৩৭৪ সাল

বিশ্বকাপ

১৯০৪ সনের কথা। স্থান: প্যারিস। ২১শে মে। যে ছটি দেশ ফেডারেশন ইন্টারন্যাশনাল ডে ফুটবল এ্যাসোসিয়েশন (ফিফা) প্রতিষ্ঠা করেছিল, তারাই অন্য আলোচনার সঙ্গে ফুটবলের 'বিশ্ব চ্যামপিয়নশীপ' চালু করা যায় কিনা—এ নিয়ে কথাবার্তা বললেন। ঠিক হল ফিফা'র সংবিধানে ঐ বিষয়টিও অন্তর্ভূক্ত হবে। একালের সেরা ফুটবল প্রতিযোগিতার বীজ পোঁতা হল। তারপর প্রায় পঁচিশ বছর অতিক্রান্ত।

ঐ সভায় ফ্রান্স, ডেনমার্ক, বেলজিয়ম, নেদারল্যাণ্ডস, স্পেন এবং সুইজারল্যাণ্ড উপস্থিত ছিল। প্রস্তাবক ছিল ফ্রান্স। কারণ, তার মাত্র কুড়ি দিন আগে ফ্রান্স বেলজিয়মের বিরুদ্ধে প্রথম আন্তর্জাতিক ফুটবল ম্যাচ খেলেছে। ডেনমার্ক খেলেছে তার চার বছর পর—১৯০৮ সনে লণ্ডন ওলিম্পিকে। সুইজারল্যাণ্ডও ঐ বছর। কিন্তু স্পেনকে ১৯২০-র ওলিম্পিকের আগে আন্তর্জাতিক ফুটবলে দর্শন মেলেনি।

ফিফা'র ঐ বৈঠকের আগে ব্রিটেনের 'চার'দল ছাড়া হাঙ্গেরী ও অষ্ট্রিয়ার আন্তর্জাতিক ফুটবলে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। কিন্তু এদের কেউ বৈঠকে হাজির ছিল না।

অনভিজ্ঞতার জন্য কিনা জানি না ফ্রান্সের হেনরী দেলানে ও জুলে রিমে'র স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হতে এক চতুর্থ শতাব্দী কেটে গেল।

১৯০৮-এর পর থেকে বিভিন্ন দেশ নিজেরা নিজেদের 'বিশ্বচ্যামপিয়ন' বলে জাহির করতে লাগল। ১৯৩০ পর্যন্ত এইভাবে চলল। এদিক ওদিক দু'চারটি দেশ নিয়ে যে খেলা হত তাতেই ঐ চ্যামপিয়নশীপ নির্ধারিত হত। এছাড়া চার বছর পরপর ওলিম্পিক গেমস তো ছিলই! কিন্তু ওকেও অনেকে 'বিশ্বচ্যামপিয়ন'-এর মর্যাদা দিতে অসম্মত ছিলেন।

দ্বিতীয় দশকের শেষের দিকে ফিফা'র প্রতিষ্ঠাতা সদস্যরা তৎপর হলেন। এদিকে ১৯২৪-এ উরুগুয়ে ওলিম্পিক জিতেছে, ১৯২৮-এও জিতল আর রানার্স আপ হল আর্জেন্টিনা। ঐ সময়কার প্রতিটি ওলিম্পিক হয়েছে ইওরোপে। ফিফা'র এটা মনঃপূত হয়নি। তারা চাইল আমেরিকাতেও এর চল করতে হবে। ১৯২৯-এ জরুরী বৈঠকে বসল। ইটালী, নেদারল্যাণ্ডস, স্পেন, সুইডেন-এর ওপর ভার পড়ল প্রথম বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতা আয়োজনের। কিন্তু শেষ মুহূর্তে দক্ষিণ আমেরিকার মনোনীত উরুগুয়ের ওপর সকল দায়িত্ব বর্তায়। অবশ্য উরুগুয়ের দিকে আয়োজনের ভার পড়াটা অস্বাভাবিক ছিল না। এর আগে পর পর দুটি ওলিম্পিক জিতেছে। উপরন্তু ১৯৩০-এ ওরা স্বাধীনতা শতবার্ষিকী উদযাপন করছিল। ইতঃপূর্বে যে দেশ 'ফুটবল পাগল' অভিহিত হয়েছে, সেই ছোট দেশে আবার ফুটবল—ফুটবলের সেরা প্রতিযোগিতা। তদুপরি শতবার্ষিকী স্বাধীনতা উৎসবের বন্যা। জাতীয় উৎসব ও বিশ্বকাপের জন্য মন্টিভিডোয় সেন্টেনারিও স্টেডিয়াম তৈরী হল।

কিন্তু প্রথম বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতা তেমন সাড়া জাগাতে পারল না। প্রতিযোগীর সংখ্যা কম থাকায় বিশ্বকাপের গৌরব যেন কিছুটা ক্ষুন্ন হল। যে তেরটি দেশ অংশ নিয়েছিল—তার ন'টিই আমেরিকার। ইওরোপের ফ্রান্স, যুগোশ্লাভিয়া, বেলজিয়ম ও রুমানিয়াও তেমন উৎসাহ নিয়ে আসেনি। সুতরাং বিশ্বকাপ আমেরিকাতে থাকাই স্বাভাবিক। তাহলেও চার গ্রুপের একটিমাত্র খেলায় মেক্সিকোকে ৪-১ গোলে হারিয়ে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখায়। সেবার ফ্রান্সের ঐটিই একমাত্র জয়।

প্রতি গ্রুপে যারা চ্যামপিয়ন হল, তারা উঠল সেমিফাইন্যালে। আর্জেন্টিনা, চিলি, মেক্সিকো ও ফ্রান্স ছিল একই গ্রুপে। কিন্তু প্রথম দুই দেশের সঙ্গে জিততে পারেনি। আর্জেন্টিনা ঐ গ্রুপে তবু চ্যামপিয়ন নয়, অপরাজিত ছিল। রুমানিয়া পেরুর সঙ্গে জিতল, কিন্তু হারল

তাদেরই তিন দলের গ্রুপের অন্যতম উরুগুয়ের সঙ্গে। বেলজিয়ম হারল পারাগুয়ে এবং ঐ গ্রুপে বিজয়ী ইউ. এস. এ-র কাছে। ইওরোপের তবু মাত্র যুগোশ্লাভিয়া সেমিফাইন্যালে পেঁছুল। হারিয়েছিল ব্রাজিল ও বলিভিয়াকে। কিন্তু উরুগুয়ের কাছে ৬-১ গোলে হারল। আর্জেন্টিনাও ইউ এস. এ-কে অমনি ভাবে পরাস্ত করে। সেবার ফাইনালে উরুগুয়ে যেমন ফাইন্যালে ৪-২ গোলে বিশ্বকাপ বিজয়ী হল, তেমনি হল ১৯৩৮-এ। ইটালী হারিয়েছিল ৪-২ গোলে হাঙ্গেরীকে। ১৯৬২ তে ব্রাজিলও বিশ্বকাপের ফাইন্যালে চিলিকে ঠিক একই ভাবে হারিয়ে বিজয়ী হয়।

১৯৩৪-এ বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয় ইটালীতে। এবার প্রতিযোগীর সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি হল। চারটি দল এল উত্তর ও মধ্য আমেরিকা থেকে। এবং চারটি দক্ষিণ আমেরিকা থেকে।

এবারও জয়মাল্য হোস্ট কান্ট্রিতে। ইটালী চেকোশ্লোভাকিয়াকে ২-১ গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপ পেল।

আপাতঃদৃষ্টিতে এবার বিশ্বকাপ বিজয়ী বিশ্বের সেরা পরিগণিত হল না। কারণ দক্ষিণ আমেরিকার দুটি দেশ এবং ব্রিটিশ 'ফোর' এই প্রতিযোগিতা থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছিল।

চার বছর পর আবার খেলা ইওরোপে। এবার ফাইন্যালগুলি ফ্রান্সে। উল্লেখযোগ্য এই প্রথম একটি এশীয় দল (ইস্ট ইণ্ডিন) বিশ্বকাপে অংশ নেয়। কিন্তু অনেক অঘটনও ঘটল। ১৯৩৮-এর জুনে ফাইন্যালের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী অষ্ট্রিয়া সার্বভৌমত্ব হারাল। কয়েকমাস পরে অন্য পক্ষ—চেকোশ্লোভাকিয়ার ভাগ্যেও ঐ ঘটনা দেখা যায়। দুঃখের বিষয় এই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাও দেশে দেশে সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থকাম হয়েছিল। এই প্রথম বিশ্বকাপের অনুষ্ঠানকারী দেশ বিশ্বকাপ পেল না। ইটালীর কাছে ফ্রান্স ৩-১ গোলে হেরে গেল। ইটালী তারপর ফাইন্যালে হাঙ্গেরীকে পরাস্ত করে ৪-২ গোলে।

তারপর বার বছর খেলা 'বন্ধ'। ফুটবল প্রতিযোগিতার বদলে বিশ্বে অন্য প্রতিযোগিতা—যুদ্ধের রণদামামা সর্বত্র। সভ্যতার নামাবলী গায় দিয়ে একে অপরকে হননে উদ্যত। সম্প্রীতি, শান্তি ও সৌহার্দের বদলে হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী। কাটল এক যুগ।

১৯৫০-এ আবার বিশ্বকাপ সুরু। ফাইন্যাল ব্রাজিলে। নিজেদের দেশের অংশে খেলা বলে এই প্রথম ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, উত্তর আয়ারল্যাণ্ড এবং ওয়েলস অংশ নিল। কিন্তু অষ্ট্রিয়া এল না, জার্মানী, সমগ্র সোভিয়েট গোষ্ঠীও অনুপস্থিত রইল। সুতরাং এবারও বিশ্বকাপের 'বিশ্বত্ব' প্রমাণ হল না।

এদিকে অন্য সমস্যা দেখা দিল। ফাইন্যালে যোলটির বদলে তেরটি দল উঠল। নাম প্রত্যাহারের ফলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। ঠিক হল বার্ষিক ব্রিটিশ ইণ্টারন্যাশনাল টুর্ণামেণ্টের খেলা বিশ্বকাপের কাজে লাগান হবে। এবং তদনুযায়ী ঐ টুর্ণামেণ্টের সেরা দুটি দলকে ডাকা হল। প্রথম ছিল ইংল্যাণ্ড এবং দ্বিতীয় স্কটল্যাণ্ড। কিন্তু 'স্কটরা' যেতে রাজি হয় নি।

তাই শূন্যস্থান পূরণ হল না। ফাইন্যালে খেলার অধিকার থেকে ফ্রান্স সামান্যের জন্য বঞ্চিত হল। যুগোশ্লাভিয়ার কাছে একটুর জন্য হেরে যায়। সমস্যা এড়াবার জন্য অবশেষে তাই ফ্রান্সকেই ফাইন্যালে তোলা হয়।

লীগ পদ্ধতির চারদেশের খেলায় ব্রাজিল প্রাথমিক পর্যায়ে চারটেয় জিতল, ড্র-এক, পরাজয়-এক। গোল দিয়েছিল ছাব্বিশটি, বিপক্ষরা এদের দেয় ছ'টি।

সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য : এমন উচ্চপর্যায়ের ফুটবল এর আগে কখনও দেখা যায়নি। ১৯৫৪-য় সুইজারল্যাণ্ড ও ১৯৫৮-সুইডেনের খেলাও ছিল নয়নাভিরাম।

১৯৫৪-য় ইউরোপে আমেরিকান কোন টীম সুবিধা করতে পারল না। পশ্চিম জার্মানী বিজয়ী হল। হাঙ্গেরী রানার্স, তৃতীয় অষ্ট্রিয়া

ও উরুগুয়ে চতুর্থ। কিন্তু ব্রাজিল কোয়ার্টার ফাইন্যালে ও উরুগুয়ে সেমিফাইন্যালে হাঙ্গেরীর কাছে পরাজিত হয়। দুটি খেলারই ফলাফল ছিল ৪-২, ৪-২। সুইজারল্যাণ্ডে সব খেলাই হয়েছিল স্বল্প দূরত্বের মধ্যে, বার্ণ থেকে ১০০ মাইলের ভেতর। সাংবাদিক, লেখক, টেলিভিশন কর্তৃপক্ষেরও সুবিধা হয়েছিল। বিশ্বকাপ তাই জনপ্রিয়ও হয়।

১৯৫৮-য় আরও প্রিয়। ৫২টি দেশ এল এবারের বিশ্বকাপে। সোভিয়েট ইউনিয়নেরও অংশ গ্রহণ এই প্রথম। এবং ১৯৫৮-র ২০শে জুন ব্রাজিল যখন ৫-২ গোলে সুইডেনকে হারাল তখন ব্রাজিলের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আর কোন দ্বিধা রইল না!

১৯৩০-এ শুরুতে যে খেলায় মাত্র ১৬টি দেশ অংশ নিয়েছিল ১৯৬২তে (চিলি) তার সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৬-য়, ১৯৬৬তে-র চূড়ান্ত পর্যায়ে ১৬টি টীম প্রতিদ্বন্দিতা করে। ইংল্যাণ্ডে এবারের খেলা এখনও কেউ ভোলেন নি। আবার ইতিমধ্যেই মেক্সিকোর (১৯৭০) পদধ্বনিও শোনা যাচ্ছে।

বিশ্বকাপে বিজয়ী দেশ

১৯৩০—উরুগুয়ে
১৯৩৪—ইটালী
১৯৩৮—ইটালী
১৯৪২ } যুদ্ধের জন্য
১৯৪৬ } খেলা হয় নি
১৯৫০—উরুগুয়ে
১৯৫৪—জার্মানী
১৯৫৮—ব্রাজিল
১৯৬২—ব্রাজিল
১৯৬৬—ইংল্যাণ্ড

স্যার স্টানলী ম্যাথিউজ

দিনক্ষণ স্মরণ নেই, তবে এটুকু এখনও বেশ মনে পড়ছে 'ফুটবলের প্রদীপ' আর আন্তর্জাতিক ফুটবলে অংশ নেবেন না বলে সেদিন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে রয়টারও ওই খবর বিশ্বময় প্রচার করলেন। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সশরীরে প্রদীপও হাজির।

সকলের প্রশ্ন এক—আপনি এত তাড়াতাড়ি অবসর নিলেন কেন ?

প্রদীপ—জানি, আপনারা স্ট্যানলী ম্যাথিউজের কথা তুলবেন। বলবেন, উনি তো বৃদ্ধাবস্থাতেও খেলে গিয়েছেন, আর আমি এই তারুণ্যে কেন অবসর নিচ্ছি। কিন্তু পৃথিবীতে ম্যাথিউজ একজনই। কারুরই সঙ্গে ওঁর তুলনা চলে না।

বিশ্বফুটবলে স্ট্যানলী ম্যাথিউজ এমনই একটি নাম। স্বর্গত ফ্রাঙ্ক ওরেলকে যে কারণে—নাইটহুড দেওয়া হয়েছিল, তেমনি সম্মানে ভূষিত হয়েছেন ফুটবলের এই এজলেস এ্যাঞ্জেল। কত উপাধি যে দেওয়া হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। কেউ বলেন, স্যার স্ট্যানলী ইজ অলওয়েজ এ্যাট হিজ বেস্ট এ্যাণ্ড ক্যাননট বি ইমিটেটেড। কেউবা—ধ্যানচাঁদের মত উনিও যাদু জানেন। স্টান ফুটবলের যাদুকর। তিনি অদ্বিতীয়। কেননা, পেশাদার ফুটবলে এ অবধি আর কেউ 'স্যার' উপাধি পাননি। ১৯৬৫ তাই ফুটবল খেলোয়াড় ও এ খেলা যারা ভালবাসেন, তাদের উভয়েরই স্মরণীয়। রাণী এলিজাবেথ ওই বছরের নববর্ষে স্ট্যানকে 'স্যার' উপাধি দেন।

সশরীরে তো দূরের কথা, চলচ্চিত্রেও ম্যাথিউজকে দেখার সৌভাগ্যই বা ক'জনের হয়েছে! কিন্তু ম্যাথিউজ আজ সবার-প্রিয়। সাত নম্বর জামা পরা এই ফুটবলার অবসর নিয়েও আজ বিশ্বের বিস্ময়।

স্ট্যানলীর খেলা দেখেছ ? যদি উত্তর হয় 'না'। এই সঙ্গে যদি আরও প্রশ্ন থাকে—বিঠোফেনের গান কিংবা চ্যাপলিনের অভিনয় ? এক্ষেত্রেও নেতিবাচক উত্তর হলে কন্টিনেণ্টের ছেলেমেয়েদের আর রক্ষে নেই। 'আনকালচারড' অথবা 'জীবনে সব কিছুই হারিয়েছ' এরকম মন্তব্য শোনা যাবে। স্টোক সিটি ক্লাবের খেলা দেখতে গিয়ে সাত নম্বরের দর্শন না পেয়ে অনেককে মাঠ ছেড়েই চলে আসতে দেখা গিয়েছে। মাঠে নেমেও যদি একবার ওই নম্বর খুঁজে না পাওয়া গিয়েছে, অমনি সকলে আঁকু পাঁকু করেছেন। টেলিভিশন দর্শক বা রীলে শ্রোতাদেরও ওই একই হাল।

স্টোক সিটি ক্লাবের আর্থিক দুর্দিন এসেছে, ঘাটতি হয়েছে পঁচাত্তর হাজার পাউণ্ড, স্মরণ করা হল বুড়ো ম্যাথিউজকে। যেন মরা হাতীর দাম লাখ টাকা। প্রৌঢ় স্ট্যানলীর আগমনে ক্লাব আবার সরগরম হয়েছে। ক্লাবের মেম্বরের সঙ্গে খেলার মাঠ 'হাউসফুল' হয়েছে। তরুণ স্ট্যানলীর চেয়ে প্রৌঢ় (?) স্ট্যানলী আরও চৌকোশ। তখন যা সুপ্ত ছিল—পরবর্তী কালে তা প্রস্ফুটিত। দুপুরুষকে এমন ফুটবল খেলা আর কে দেখাবেন ! অবশ্য ম্যাথিউজ এজন্য দর্শকদের কাছে সবচেয়ে ঋণী। "ওরাই আমাকে বুড়ো হতে দেন নি।"

স্ট্যানলীর ফুটবলের কৌশল বোঝা খুবই দুষ্কর। বিপক্ষের রক্ষণ ভাগের কথা ছেড়েই দিলুম, নিজের সতীর্থরাও বুঝে উঠতে পারতেন না রাইট উইঙ্গার কার কাছে ক্রশ সেণ্টার করবেন। দ্রুত বল নিয়ে অগ্রসর হতে হতে হঠাৎ তিনি থেমে যান। লাল-সাদার এই সাত নম্বর জার্সিকে কিছুতেই বিশ্বাস করা যেত না। তবে এটুকু বোঝা যেত, স্ট্যানলীর পায়ে বল গেলে আর রক্ষে নেই। বিপক্ষদলে তখন থরহরি। তাদের সমর্থকদের ঈশ্বরকে স্মরণ ছাড়া অন্যকোন উপায় থাকতো না। এমনই খেলোয়াড় ইনি। ১৯৫৭-য় নামের শেষে 'সি. বি. ই' জুড়ে দিয়েছেন ব্রিটিশ সরকার। ষ্টোক সিটিতে স্ট্যানলীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এসব সাম্প্রতিক কালের কথা।

তিনি আজ খ্যাতির শীর্ষে। ষ্টোক সিটি ক্লাব আজও তার জন্য বিশিষ্ট।

অথচ চোদ্দ বছর বয়সে স্ট্যানলী যখন ঐ ক্লাবে ঢুকেছিলেন, ফুটবলের সঙ্গে কোন সম্পর্কই ছিল না। চাকরি প্রায় চাকরের। পদ- 'অফিস বয়'-এর। ফাইল পত্তর এদিক ওদিক নিয়ে যাওয়া। ফাই-ফরমাইস খাটা ইত্যাদি ছিল তার কাজ। এ মাত্র এক বছর করতে হয়েছিল। চাকরিতে ঢোকার পরের বছরই তাকে ষ্টোক সিটি টীমে দেখা গেল। এবং সেই যে খেলা স্থরু তার শেষ হয়েছিল ষোল বছর পর। একত্রিশ বছর বয়স অবধি ছিলেন ওই ক্লাবে। ষোলটি বছর একই 'ফরম'-এ খেলা। আমাদের দেশে এখনও গল্পকথা। মতান্তরের জন্য স্ট্যানলী তারপর চলে গেলেন 'ব্লাকপুল' ক্লাবে। সেখানেও এক নাগাড়ে চোদ্দ বছর। মোট তিরিশ বছরের ফুটবল জীবন অর্থাৎ কিংবদন্তী (এদেশে)। কিন্তু ওদেশে নয়। কারণ বিলি মেরেডিস পঞ্চাশ বছর বয়স অবধি নিয়মিত খেলে গিয়েছেন। কিন্তু ম্যাথিউজ তাকেও অতিক্রম করেছিলেন। একষট্টিতে ছাড়লেন 'ব্লাকপুল'। কেউ ভেবেছিলেন—এবার ইনি অবসর নিচ্ছেন, কেউবা—খেলা ছেড়ে কোচিং করবেন। অবশ্য একমাত্র ষ্টোক সিটির ম্যানেজার জানতেন, ম্যাথিউজ কোথায় যাবেন কি করবেন! টনি ওয়াডিংটন যখন খবরটা জানালেন ষ্টোক সিটির সকলেই চিন্তিত। নানান জনের নানা প্রশ্ন। আড়াই হাজার পাউণ্ড ট্রান্সফার ফি দিয়ে পড়তি খেলোয়াড়কে এনে কি হবে? ম্যাথিউজ নিজেও ভাবিত। 'কথা তো দিলুম, কি জানি কি হবে!'

কিন্তু '৬১-র ১৭ই অক্টোবর হাণ্ডারফিল্ডের বিরুদ্ধে মাঠে নেমে ম্যাথিউজ একবার দর্শক গ্যালারীর দিকে তাকালেন। দেখলেন—তিল ধারণের জায়গা নেই, চোদ্দ বছর পর ষ্টোক সিটির পুরোন মেম্বরদের চোখে আবার জল (!)। তবে এবার বেদনার অশ্রু নয়, আনন্দের। যাদু দেখে সকলে সেদিন বাড়ি ফিরেছিলেন।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগবে স্ট্যানলী কি যাদু জানেন! তাহলে এর বাবার কথায় ফিরে যেতে হয়। বাবা জ্যাক ম্যাথিউজ ছিলেন খ্যাতনামা মুষ্টিযোদ্ধা। কাজ করতেন সেলুনে। নাপিত হলেও ছেলের দিকে কড়া নজর রাখতেন। "রোজ ভোরে উঠে ব্যায়াম করবে, নইলে শরীর খারাপ হয়ে যাবে"। এই ছিল বাবার নির্দেশ। স্ট্যানলী বড় হয়ে চাকরিতে যোগ দিলেও ছেলের সব টাকা বাবা নিজের কাছেই রাখতেন —পাছে ছেলে গাড়ি ঘোড়া চড়বে এই ভয়ে। কর্মস্থলে তাই ৪+৪ =৮ মাইল পায়ে হেঁটে যাতায়াত করতে হত। পঞ্চাশ বছরেও তাই স্ট্যানলী ম্যাথিউজের শরীর ইস্পাতসম। বয়সের ভারে তিনি নুয়ে পড়েন নি।

বাবা জ্যাকের বিশ্বাস ছিল—ছেলে আমার বড় হবেই। সুতরাং ছোটবেলা থেকেই তার প্রচেষ্টা। ১৯৫৩-য় এফ, এ কাপ ফাইন্যালের কথা মনে পড়েছে—। বোল্টন ওয়াণ্ডারার্সের বিপক্ষে ব্লাকপুল ৩-১ গোলে হারছিল। জেতার কোন আশাই নেই। কিন্তু শেষ কুড়ি মিনিটের মধ্যে স্ট্যানলী একাই তিনটি গোল করলেন। ব্লাকপুল পেল এফ. এ কাপ এবং স্ট্যানলী কাপ বিজয়ীর প্রথম পদক। 'ছেলে পদক পাক'—এও জ্যাক-এর ইচ্ছা ছিল। ১৯৪৮ ও ১৯৫২ দুবার ব্লাকপুল এফ. এ কাপের ফাইন্যালে উঠলেও বিজয়ীর পদক পাওয়ার সৌভাগ্য হয় নি। ম্যাঞ্চেষ্টার ইউনাইটেড ও নিউ ক্যাসল-এর কাছে হেরেছিল ব্লাকপুল। 'পর পর তিনবার হারবো'—এ অসম্ভব। তিপ্পান্নয় তাই হেরে গিয়েও স্ট্যানলী ফুটবল জীবনে তিল তিল করে সঞ্চয় করা সব অভিজ্ঞতা, সব সাধনা, সব কুশলতার সমন্বয় করে বোল্টন ওয়াণ্ডারার্সের বিরুদ্ধে জীবন পণ লড়েছিলেন। বাবার কথা রেখেছিল ছেলে। এমন ফুটবলারকে নিয়ে মাঠের বাইরেও অঘটন ঘটলে তাই কিছুই বলার থাকেনা।

১৯৪৭-এ ষ্টোক সিটি ছেড়ে যখন ব্লাকপুল-এ গেলেন তখন সারা সহর পোষ্টারময়। কিছু ব্লাকপুল ক্লাবের বিরুদ্ধে, অধিকাংশ ছিল

ওর সম্পর্কে। 'দল পরিবর্তন চলবে না, চলবে না'। ইত্যাদি। একষট্টিতে যখন ফিরে এলেন ষ্টোক সিটিতে তখন আবার ঐরকম। সাতচল্লিশে ষ্টোক সিটির যে সমর্থকরা 'দল পরিবর্তন চলবে না' বলেছিলেন এবার তারাই ছাপলেন 'স্বাগতম'। আর ব্লাকপুলের ওরা 'চলবে না, চলবে না।'

যুগন্ধর পেলে

"এবার বিশ্বকাপের পর আমার আর কিছুই করণীয় থাকবে না। ইংল্যাণ্ডের খেলার গতি প্রকৃতির কাছে হয়তো আমার সব সাধনা নিষ্ফল হবে।"

গত বিশ্বকাপ (১৯৬৬) খেলতে যাওয়ার আগে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে যুগন্ধর খেলোয়াড় পেলের মন্তব্য এটা। ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছিল। কয়েক সপ্তাহ পরে বিশ্বকাপ খেলা শেষে তার মুখে শোনা গেল "পরাজয়ে আমি দুঃখিত নই। শুধু আফশোস রয়ে গেল, আমায় খেলতে দেওয়া হল না! আমাদের ফুটবল ফেডারেশন যদি আগামী বিশ্ব চ্যামপিয়নশীপসের জন্য আমাকে মনোনীত করেন, সেখানে আমি অনুপস্থিত থাকবো। কারণ, 'আদর্শ ফুটবল' খেলা আর সম্ভব নয়। যাঁরা এ খেলা দেখে নির্মল আনন্দ পেতে চান, তাদের দিন শেষ হয়েছে, ফুটবলে এখন বীভৎস রসের আগমন।"

বিশ্বকাপে ব্রাজিলের পরাজয়ের কারণ একাধিক হলেও নিরপেক্ষ দর্শকরা সবচাইতে দায়ী করেছিলেন রেফারীর পক্ষপাতিত্ব। ফাউলের পর ফাউল হয়েছে রেফারী ব্রাজিলের পক্ষে কিক্ দেন নি। ইচ্ছাকৃত ভাবে 'মারা' হয়েছে দৃকপাত করেন নি।

ব্রাজিল তারপর দেশে ফিরেছে। লজ্জায় মুখ দেখান দায় হয়েছিল। দেশে নিন্দার অন্ত নেই। পেলে সিদ্ধান্ত নিলেন আর ফুটবল নয়। এবার ইতি। কয়েকমাস অন্য খবর। বিদেশের টীমগুলো পেলেকে নিয়ে টানা হ্যাঁচড়া সুরু করেছে! কেউ বলছেন, মাসে কুড়ি হাজার টাকা দেব, কেউবা—না, আরও বেশি, ওর ডবল। কয়েকদিন দেশবিদেশের খেলার খবরে আবার শিরোনাম।

পেলে সত্যিই শিরোনাম। বিশ্বখ্যাত মাত্র সতের বছর বয়সে। এত অল্প বয়সে এমন খ্যাতি বোধহয় আর কারুর জীবনে ঘটেনি—একমাত্র পিতৃসূত্রে সিংহাসন পাওয়া ছাড়া। রাজা, মহারাজার বংশে না জন্মেও পেলে ওই বয়সে 'কিং'। অন্যদের মত অন্য! 'ব্লাক পার্ল', 'ব্লাক সিজার' বা 'সান গড'। 'পেলে' ওর ডাক নাম। আসল নাম এডসন এ্যারাণ্টেস ডু ন্যাসিমেণ্টো। জন্ম ১৯৪০ এর ২৩শে অক্টোবর। বাবা ছিলেন পেশাদার ফুটবলার। ব্রাজিলের মিনাস গেরাইস অঞ্চলের ট্রেসকোরাকোস শহরে পেলের বাবা প্রায় সকলেরই কাছে পরিচিত ছিলেন। সুতরাং ছোট্ট ছেলের ফুটবল—প্রীতিটা স্বাভাবিক ছিল। দশ বছরের ছেলের খেলা দেখে বাবা মাঝে মাঝে অবাক হতেন। ভাল কোচ দিলেন ছেলের পেছনে। পাঁচ বছরের মধ্যে পোক্ত হয়ে উঠল 'ডিকো' (বাড়ির নাম)। 'সাসি'-র (বন্ধু মহলের নাম) খেলায় কেউ কেউ পাগল। ত্বরও সইল না। ষোল বছরের ছেলে নিজের শহর ট্রেসকোরাকোস ছেড়ে ব্রাজিলের বিখ্যাত কফি শহর (ও বন্দর) স্যাণ্টোস-এ চলে গেল। পেলে সেই থেকে স্যাণ্টোসের সদস্য। বছর না ঘুরতেই আরও খ্যাতি। সাতান্নয় ব্রাজিলের পক্ষে আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক খেলায় দেখা গেল কুকাট চুলের এই কলো ছেলেটিকে। তারপর গেল ইওরোপে—১৯৫৮-য় বিশ্বকাপ খেলতে। বিশ্বফুটবল যারা দেখলেন, এক বাক্যে স্বীকার করলেন ফুটবলের রাজা এসেছে এতদিন পর।

প্রকৃত পক্ষে ফুটবলের রাজা পেলে। গত বিশ্বকাপে পরাস্ত হলেও ব্রাজিলের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। তেমনি অনস্বীকার্য ওই দলের সেরা পেলেও।

'নখদর্পনে' ও 'উদীয়মান' পর্যায়ে এদেশের সিনিয়র ও জুনিয়র সকলের কাছে শুনেছি—তারা পেলের মত হতে চান। বইয়ে পড়ে, ছবি দেখেই তারা এই যুগন্ধরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ইনিই একমাত্র উপাস্য খেলোয়াড় বোধ হয় বিশ্বের পয়লা নম্বর খেলোয়াড় বলেই। অনেককে পেলের অনুকরণ করতে দেখেছি। বারংবার ওর খেলার ধীরগতির চলচ্চিত্র দেখে অনুসরণের চেষ্টা হয়েছে দেশবিদেশে। চেষ্টা হয়েছে তার কৌশল আয়ত্তের। কিন্তু সব নিষ্ফল, সব প্রচেষ্টা বানচাল।

পেলে এমনই খেলোয়াড় যে, একই দিনে একভাবে দ্বিতীয় বলটি মারেন না। খেলেন লেফট ইন-এ। কিন্তু স্মরণকালের মধ্যে কেউ তাকে একই ভাবে দুটি গোল করতে দেখেন নি। 'ড্রিবল'-এর মধ্যেও বৈশিষ্ট্য। মহাকবির লেখনীর নব নব সৃষ্টির মতন নব নব সংযোজন, তেমনি পেলের খেলাতেও। বৈজ্ঞানিকের মত নব নব আবিস্কারের সন্ধান ফুটবলের পেলে-তে। খেলা নয়, যেন ছবি। পেলের পায়ে বল পড়লে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

একজন প্রবীন খেলোয়াড়-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল পেলে কোন পায়ে ভাল খেলেন?

উত্তর: বলা মুস্কিল। দু পা-ই সমান বললে যথার্থ বিচার হবে না। ডান পা-কে বুলেট বললে, বাঁ পা-কে বলতে হবে টর্পোডো।

—আর হেড?

—উচ্চতায় অনেকের চাইতে খর্বকায়। কিন্তু লাফিয়ে উঠে সকলের আগেই প্রয়োজনমত বল পাঠিয়ে দেয়।

গুরু 'দ্য ড্যান্সার' ওয়াসেডেমোর ব্রিটোর। বাবার মত গুরুও বলতেন, এ ছেলে হীরের টুকরো। উভয়ে এত প্রশংসা করতেন যে, অনেকের হিংসার পাত্র ছিল তরুণ পেলে। বিরুদ্ধ সমালোচনাও হত।

কেউ কেউ বলেন, পেলে খেলার মাঠে উগ্র প্রকৃতির। এজন্য একাধিকবার মাঠ থেকে বার করে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু ১৯৫৮ ও ১৯৬২-তে ব্রাজিলের বিশ্বকাপ বিজয়ের পর আর কোন সমালোচনা শোনা যায় নি। বরং যারা পেলেকে নিয়ে একদা পরিহাস করতেন, পরবর্তীকালে তারাই ওর সবচাইতে বড় সমর্থক হয়েছিলেন।

১৯৫৮-র ফাইন্যাল সুইডেনের বিরুদ্ধে ব্রাজিল যে দুই গোলে জেতে তার দুটিই দিয়েছিলেন পেলে। এই বছরই বিশ্বের সেরা খেলোয়াড় পরিগণিত হন। পায়ে আঘাতের জন্য ১৯৬২-র ফাইন্যাল না খেললেও অন্যান্য খেলায় এর অবদানই ছিল সর্বাধিক।

গোল দেওয়া পেলের 'নিত্য কর্ম।' বড় বড় খেলায় হাফ ডজন গোল দিলেও আশ্চর্যের কিছু নয়। তাই এ পর্যন্ত কত গোল করেছেন তার হিসেব দেওয়া মুস্কিল।

পেলে পেশাদার :খেলোয়াড়। সুরুতে তাকে দিতে চাওয়া টাকার কথা বলা হয়েছে। সত্যই একজন ফুটবলারের দাম যে এত হতে পারে তা অকল্পনীয়। স্যাণ্টোস দলের এই খেলোয়াড়কে (১৯৬১-তে) ইটালীর জুভেণ্টাস ক্লাব তাদের দলে নিয়ে যাওয়ার জন্য ১৯ লক্ষ টাকা 'পরিবর্তনের' ফি দিতে চেয়েছিল। এদিক দিয়েও পেলে সবচেয়ে ধনী। শুধু খেলে মাসে রোজগার করেন ষোল হাজার টাকা। ভাবি কবে আমার দেশে এর আংশিক রোজগার করতে পারবেন বড় বড় খেলোয়াড়রা। আর কবেই বা শেষ হবে রুটি, আলুর দম কিংবা খেলা প্রতি দু পাঁচটাকার ভাড়া খাটা! ('সেদিন আসিবে কবে'!)।

যাক পেলের কথা হচ্ছিল। বিজ্ঞাপনেও পেলেকে ব্যবহার করা হয়। শিশুদের টনিক, সাওপোলোর কফি সবই পেলেময়। এজন্যও হাজার হাজার টাকা। কিন্তু নৈতিকতায় তিনি ভীষণ বিশ্বাসী। সিগারেট বা মদের বিজ্ঞাপনে নিজের নাম বা ছবি ব্যবহারে প্রবল আপত্তি। বলেন এতে খেলোয়াড়ের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হবে।

এত অর্থ, এত খ্যাতির অধিকারী হয়েও পেলে একেবারে সাদাসিধে। ছোট বেলার বন্ধু—তা সে যে কাজই করুক না কেন আজও তার অবারিত দ্বার। কিন্তু কম কথা বলেন। বলেন মিছে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। মা, বাবাকে দেখাশোনার পর সোজা চলে যান স্যান্টোসের সমুদ্রতীরে। ওই মাঠ আজও তার পবিত্র। আজও নিয়মিত অনুশীলন করেন ওখানে।

তাও যদি ভাল না লাগে গ্রামোফোন নিয়ে বসে যাবেন ফুটবল খেলোয়াড়। হাজার হাজার রেকর্ড তার ঘরে। কোন্‌টা বাজাবে ঠিক করে উঠতে পারে না। চোখ বুঁজে তাই যে কোন একটা তুলে চাপিয়ে দেয় ডিস্কের ওপর। এও যদি খারাপ লাগে—চলে যান সিনেমায় তবে নতুন ছবি হওয়া চাই।

বিশ্বের সেরা হয়েও কোন রকম অহমিকা নেই। নেই দম্ভের লেশমাত্র। ক্যাসিয়াস ক্লের মত বলেন না 'আমিই সবার সেরা'। নম্র ও বিনয়ী। গতবার বিশ্বকাপের খেলায় ব্রাজিলের ওপর আঘাতের পর আঘাত হানা হলেও ব্রাজিল শঠে শাঠ্যং নীতি অবলম্বন করে নি। খেলার মাঠে বারংবার এই যুগন্ধরকে মারা হয়েছে। হাঁটুর নীচটা কেটে হাড় বেরিয়ে গিয়েছে। পেলে আঘাতের বদলে আঘাত হানেন নি। হোটেলে ফিরে ট্রাউজার খুলে ব্যাণ্ডেজটি লক্ষ্য করেছেন, সকলের অলক্ষ্যে চোখের জল ফেলেছেন।

যে যেভাবেই গোল দিক না কেন—পেলে কোন মন্তব্য করে না। প্রায় সাড়ে ছশ' স্কোরের অধিকারী পেনাল্টিতে গোল দেওয়া সম্পর্কে অত্যন্ত বিরূপ। বলেন ঃ ও একেবারে কাপুরুষতা।

এত বড় খেলোয়াড় হয়েও নিত্যকর্মের মধ্যে অন্যতম নিজের খেলার ফিল্ম দেখা। কোথায় ভুল হল—এই।

ইওসেবিও ঃ ইওরোপের পেলে

বয়স তখন মাত্র বারো। ছেলেটি খালি পায়ে ফুটবল খেলছিল। শুধু খেলছিল। শুধু খেলছিল, বললে ভুল হবে। বলতে হয় চমৎকার খেলছিল। দূর থেকে একজন দেখলেন। খেলার পর সস্নেহে ডেকে নিলেন। ওরই মাপের এক জোড়া বাতিল বুট ছিল। পরিয়ে দিলেন। লাউরেঙ্কো মার্কুইস ক্লাবে আসার পর অবশ্য ওই বুট আবার বাতিল হয়। ক্লাব নতুন বুট কিনে দিয়েছিল।

আরও পিছনে চলে গেলে দেখা যাবে—১৯৪৩-এর ৫ই জানুয়ারী এই ছেলে ভূমিষ্ঠ হয়েছে মোজাম্বিকে। পাঁচ বছর বয়সে বাবা পরলোকে। মা, দুই বোন ও দুই ভাইকে নিয়ে সংসার।

ফুটবল খেলার সময় কোথায়? ইওসেবিও ডি সিলভা ফেরিরা তবুও কোনরকমে সময় করে নিত। সুযোগ পেলেও ১৯ বছর বয়সে সে ইওরোপে যেতে পারল না। প্রচণ্ড আর্থিক অনটন। মা শ্রীমতী ডি. সিলভার মুখের দিকে তাকিয়ে ছেলের মুখ শুকিয়ে যেত। ভাগ্যের ওপর সব ছেড়ে দিলেও ওর দৃঢ় ধারণা ছিল চেষ্টা করলে জীবনে উন্নতি করা অসম্ভব নয়। বলত, সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে।

এই দৃঢ় ধারণা এর চিরকাল এবং এজন্যই বলেন, "আই হোপ টু প্লে ফর এ লং টাইম" এতো কেবল সুরু! ফুটবলারদের আদর্শ হওয়া উচিত স্যার স্টানলী ম্যাথিউজ ও ডি. ষ্টিফানো। "আমি আশা করছি, ওদের মত দীর্ঘকাল খেলতে পারবো।"

১৯৬৫-র অক্টোবরে বিয়ের পর ইওসেবিও আরও আত্মবিশ্বাসী হয়েছেন। "এ পর্যন্ত যত ভাল কাজ করেছি বিয়ে তার মধ্যে অন্যতম। সুখ শান্তি ও জীবনকে উপলব্ধি করার একমাত্র পথএ।"

খেলার মাঠে ইওসেবিও-র কথায় পরে আসছি। আগে বলছি ভোটাভুটির কথা। সাপ্তাহিক পত্রিকা "ফ্রান্স ফুটবল" আয়োজিত পয়ষট্টিতে ইওরোপের ২১টি দেশের সাংবাদিকদের ভোটে বছরের সেরা ফুটবলার নির্বাচিত হন এই খেলোয়াড়। ইওসেবিও পেয়েছিলেন ৬৭ ভোট, দ্বিতীয় হন ফেচাটি। তিনি ৮ ভোট কম পান। তৃতীয় সুয়েরেজ এর ব্যবধান ছিল ২২। পৌষট্টিতে এই নির্বাচনে ইওসেবিও ছিলেন চতুর্থ। প্রথম হয়েছিলেন ডেনিস ল। সংক্ষেপে ইওসেবিও বলা হলেও খেলার গুণে এই গুণী অন্য নামে পরিচিত। সকলে বলেন, ইওসেবিও ইউরোপের পেলে।

১৯৬১-র কথা। লিসবনের স্পোরা লিসবোয়া বেনফিকা ক্লাব মাকু´ইস ক্লাবের কাছ থেকে পাঁচ হাজার সোয়া ছয়শ' পাউণ্ডের বিনিময়ে ইওসেবিওকে নিয়ে এল। তার আগের বছর বেনফিকা ইওরোপীয় কাপ চ্যামপিয়নশীপসে রিয়াল ম্যাড্রিদের একচেটিয়া অধিকার খর্ব করেছে। পরের বছরও বেনফিকা ইওরোপীয় কাপে রিয়াল ম্যাড্রিদকে হারান ৫-৩ গোলে। এর মধ্যে ইউসেবিও দিয়েছিলেন ২টি। ইওসেবিও এই ভাবে এগিয়ে চললেন। দু বছর আগে ইউনাইটেড প্রেস ইণ্টারন্যাশনালের ক্রীড়া সমালোচক এ্যাণ্টনী এস. ব্রিটো জানিয়েছিলেন—সাওপোলোর (দক্ষিণ আমেরিকা) ভাস্কো-ডা-গামা ক্লাব এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ডের বিনিময়ে কিনতে চেয়েছেন। কিন্তু বেনফিকা তাতে রাজি হয়নি। বেনফিকার জনৈক মুখপাত্র বলেছিলেন, ইওসেবিওকে ছেড়ে দিলে সারা পর্তু´গাল ক্ষেপে যাবে। তাই যত টাকাই লাগুক আমরা ওকে রাখবই। ইওরোপের পেলেকে আমরা ছাড়ব কোন মতিভ্রমে!

আমেরিকার (ব্রাজিল) পেলে-র সঙ্গে তুলনা করা উচিত না হলেও ইওসেবিও দ্বিতীয় পেলে। বর্তমান ইওরোপের সেরা খেলোয়াড়। ইওসেবিও তাই দ্বিতীয় পেলে। জিমি আর্ম ফিল্ডও একে "ওয়াল্ড´ স্পটলাইট নম্বর টু" আখ্যা দিয়েছেন। এক নম্বর হলেন পেলে।

১৯৬১তে বেনফিকায় এসে ইওসেবিও ১৯৬৬-এর ফেব্রুরারী পর্যন্ত ২১বার জাতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। বিশ্ব একাদশে খেলেছেন একবার আর ইওরোপীয় একাদশে দুবার। সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার হিসেবে দুবার 'সিলভার বল' পেয়েছেন।

গতবছর বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার মূলেও ইওসেবিওর অবদান ছিল সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। ডি. ষ্টিফানো, পেলে বা পুশকাস কার কোন্ গুণ এর মধ্যে আছে ব্যাখ্যা না করাই উচিত। ইওসেবিওর উক্তিই উদ্ধৃত করছি...."আই ওনলি নো হোয়াট আই অ্যাম গোয়িং টু ডু আফটার আই গেট দ্য বল।" ঐ তিন নিপুণ খেলোয়াড়ের একত্র সমন্বয় দেখা গিয়েছে ইওরোপের পেলের মধ্যে। ফুটবল মাঠে গত চার বছর তার মত খেলোয়াড় দেখা যায় নি।

ইওসেবিও-র এই বড় হওয়ার মূলে একজনের নাম সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য তিনি দলের ম্যানেজার বেলা গুটম্যান। তারই আনুকূল্যে প্রথম ইওরোপীয় কাপে খেলার সুযোগ পায় এই দু নম্বর পেলে।

ইওসেবিওকে জনৈক সাংবাদিক জিজ্ঞেস করেছিলেন—ফুটবলকে ভালবাসেন কেন? আরও তো কত খেলা ছিল।

—আমি ঠিক বলতে পারিনা, ফুটবল কেন ভালবাসি। ছোট বেলায় একদিন কয়েকটা কিক করতেই কেমন যেন ভাল লেগে গেল। অতঃপর ফুটবল আমার জীবন হয়ে উঠেছে। ওর প্রেমে পড়ে গেলাম।

৭০ হাজার সদস্যের বেনফিকা ক্লাবের মধ্যমণি আজ এই ফুটবলার। ক্লাবের নিজস্ব ষ্টেডিয়ামে খেলা হলে তাই বাইরের দর্শক বেশি দেখা যায় না। কেননা, স্টেডিয়ামে বসতে পারেন মাত্র ৭৫ হাজার দর্শক। অবশ্য বেশি ভীড় হলে বেঞ্চ বা চেয়ার পেতে ৯০ হাজার বসার ব্যবস্থাও করা হয়।

আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী ১৯৬২ থেকে বিশ্বকাপের খেলা থেকে। ইংল্যাণ্ডের কাছে পোর্তুগাল সেবার ২—০ গোলে পরাস্ত

হয়েছিল ; কিন্তু ইওসেবিও এমন সব কিক করেছিলেন যে ওয়েমব্লির গোলপোস্ট মেরামত করতে হয়েছিল।

পাঁচ ফুট সাড়ে সাত ইঞ্চি লম্বায়। ওজন প্রায় চুয়াত্তর কিলোগ্রাম। চুল ক্রুকাট। কিন্তু খেলার মাঠেও কপালে যেন পড়ার চিন্তা। চরম মুহূর্তে দেখা যাবে ইওসেবিওর কপাল কুঁচকে গিয়েছে। (তবে কি এই জন্যই আরেক নাম ইওরোপের ব্লাক পান্থার ?) ভাল করে লক্ষ্য করলে গলায় ক্রুশ দেখাও যায়। ইউরোপে আসার আগে মা ওটি দেন। অবশ্য আসল চেনটি এখন আর নেই। নুরেমবার্গের সঙ্গে ইউরোপীয় কাপে খেলার সময় ছিঁড়ে যায়।

ব্লাক পান্থার অনেক সময় অনেক কৌশল আঁটেন। একবার দেখা গিয়েছিল খোঁড়াতে খোঁড়াতে মাঠের একধারে চলে গিয়েছে। কিন্তু বল কাছে যেতেই রুদ্রমূর্তি। গোল দিয়ে তবে বল ছেড়ে ছিলেন। ৩৫ গজ দূর থেকে সট করে গোল দেওয়াই তার সহজাত। রিয়াল ম্যাড্রিদ দলের সভাপতি তাই বোধহয় একবার এক খেলার আগে বলেছিলেন, ইওসেবিও খেলুক, হারজিত হবেই এবং কয়েক মিনিট সময় লাগে এ সিদ্ধান্তে পেঁছুতে। বলাবাহুল্য বেনফিকা সেই খেলায় ৪ গোলে জিতেছিল। এক ইওসেবিও গোল দেন দুটি।

মাঠে এই মহান খেলোয়াড়ের সব চেয়ে বড়গুণ—কখনও ইনি ফাউল করেন না। উত্তেজিত হন না। বরং প্রতিপক্ষ দল একে প্রতিরোধ করতে না পারলেই বে-আইনী ভাবে এর ওপরই ঝাঁপিয়ে পড়ে। বহু ক্ষেত্রে তাই মার খেতে হয়। এমনও দেখা গিয়েছে সতীর্থ বা প্রতিপক্ষ দলের বিরুদ্ধে শঠে শাঠ্যং করতে চেয়েছেন। কিন্তু সেখানেও ইওসেবিওর নিষেধাজ্ঞা। বন্ধুরা সেখানে পরাস্ত। ইওসেবিও বিজয়ী। তবে সর্বত্র নয়। একমাত্র মা'র কাছে এই বিশ্ববিজয়ী আজ পরাজিত। বন্ধুরা বলে, একমাত্র এই জায়গায় তুমি হেরেছো।

যে খেলাই হোক না কেন ইওসেবিও খেলা শেষে মাকে দীর্ঘ চিঠি লেখেন। আর কোন গুরুত্বপুর্ণ খেলা হলে তো সরাসরি টেলিফোন। বেনফিকার মরচে টেলিফোন বুক করা হয় মোজাম্বিকের বাড়িতে।

এমন বিত্তশালী ও খ্যাতনামা খেলোয়াড় কিন্তু মোটরে চড়া পছন্দ করে না। ট্রামেই বেনফিকা মাঠে যান।

দুঃখ—একমাত্র বাড়ির কথা মনে পড়লে। কোথায় লিসবন আর কোথায় ইওরোপ। কয়েক হাজার মাইল যে!

পুশকাস

১৯৫৯-৬০—২৬ (সর্বোচ্চ গোলদাতা)
১৯৬০-৬১—২৭ (সর্বোচ্চ গোলদাতা)
১৯৬১-৬২—২০ (সর্বোচ্চ গোলদাতা)
১৯৬২-৬৩—২৬ (সর্বোচ্চ গোলদাতা)
১৯৬৩-৬৪—২০ (সর্বোচ্চ গোলদাতা)

লীগ খেলায় ফেরেঙ্ক পুশকাসের দেওয়া গোলের সংখ্যা এই। স্প্যানিশ লীগে প্রথম বছরেই পুশকাস ২৫টি খেলায় ২১টি গোল দিয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। সেবার গোলদাতা রূপে তার স্থান হয়েছিল দ্বিতীয়। ওপরের গোলের সংখ্যাগুলিই প্রমাণ, তিনি সর্বকালের একজন সেরা ফুটবলার। অবশ্য গোলের সংখ্যাগুলি থেকে তার খেলার কলাকৌশল জানা সম্ভব নয়। বিপক্ষরা জানতেন মাঠে নেমে পুশকাসকে ঠেকাতে পারলেই অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তাও সম্ভব হয় নি! গোলকীপাররা প্রস্তুত হতেন, পজিশান নিতেন, কিন্তু ফেরেঙ্ক পুশকাসকে ঠেকান

দায় হত। নব নব ক্রীড়াধারায় সকলের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করতেন এই খেলোয়াড়।

পুশকাসের খেলার কথা বলতে গেলে তার ছেলেবেলার নানারংয়ের দিনগুলিতে ফিরে যেতে হয়। ছেলেবেলার কথা আলোচনা করলে দেখতে পাব—চুরি করে খেলার টিকিট কিনছে। দলবল নিয়ে সুড়ঙ্গ কেটে মাঠে ঢুকছে। বাবা নামকরা ফুটবলার হওয়া সত্ত্বেও ছেলের খেলায় প্রবল আপত্তি। আর তার বিরুদ্ধেই কিশোর পুশকাসের বিদ্রোহ। ছেঁড়া ন্যাকড়া, কম্বল দিয়ে তৈরী বল নিয়ে গরু চরাবার মাঠে নেমেছে। বন্ধুদের কেউ সেজেছে জ্যামারা, কেউ ড্রেক, কেউবা বুচান। তৎকালীন হাঙ্গেরীর সেরা সেরা খেলোয়াড়ের নাম নিয়ে মাঠে নেমেছে। পুশকাস প্রমুখ একলব্য, আর ওরা দ্রোনাচার্য। বলাবাহুল্য তখনও ওই সেরাদের খেলা দেখারও সৌভাগ্য হয় নি। পত্রপত্রিকায় বা কারুর মুখে শুনেছিল ওদের কথা।

জন্ম ঃ ১৯২৭-এর ২রা এপ্রিল। বাড়ি বুদাপেস্টের কয়েক মাইল দূরে কিসপেটে। দিনের বেশির ভাগ সময় কাটত খেলার মাঠে। ড্রেক, জ্যামারা সাজলেই চলবে না, ওদের খেলা দেখাও চাই! কিন্তু পয়সা কোথায়? কবরখানার পাঁচিলে কিংবা গাছের মাথায় চড়াই ছিল একমাত্র উপায়। গেটকীপার ফাঁকিও দিল কয়েকবার।

বয়স তখন মাত্র দশ। কিসপেটের ফুটবল কোচ ল্যাণ্ডর জ্যাকসএর নজর পড়ল ওর ওপর। পুশকাস তখনও ন্যাকড়ার বল খেলছে। কোচ জ্যাকস ছেলেটিকে ডেকে নিয়ে ড্রেসিং রুমে গেলেন। বললেন; খুশিমত বুট বেছে নাও। পুশকাসের পা'র মাপে কোন বুট ওখানে ছিল না। সে তাই বড় বুট পরেই নামল (ভেতরে ন্যাকড়া ঢুকিয়ে মাঠে নামতেই জ্যাকস বুঝলেন—এ ছেলে একদিন বড় হবেই। ওর বাবাকে গিয়ে বললেন। অতঃপর তারও মতের বদল হল। দুজনে

মিলে লাগলেন ওর পেছনে। ফেরেঙ্ক তখন থেকেই সর্বোচ্চ গোলদাতা। বন্ধুরা বলত কিং অফ স্কোরার।

বাবা ও মাস্টার মশাই দুইয়ের আনুকূল্যে বড় বড় খেলোয়াড়দের খেলা দেখতে কোনরকম অসুবিধা হল না। পুশকাস ওদের খেলা দেখে এসে দিনের পর দিন বল রিসিভ, ডেলীভারী প্র্যাকটিশ করত। বল শূন্যে রাখার অনুশীলনে ২০০ বার বল মেরে মেরে শূন্যে রাখতেও দেখা গিয়েছে। চোখ বেঁধে লক্ষ্যে বল মারতেন, মাঠের মধ্যে খুঁটি পুঁতে কৃত্রিম প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করতেন। বলের দিকে দৃষ্টি না দিয়েই বল নিয়ে সোজা ছুটতেন।

আন্তর্জাতিক ফুটবলে পুশকাসের প্রথম আগমন ১৯৫৪-য়। বয়স মাত্র ১৮। সেবার তার দেওয়া গোলেই হাঙ্গেরী জিতেছিল। অতঃপর পুশকাশ মানেই হাঙ্গেরী, হাঙ্গেরীর ফুটবল মানেই ফেরেঙ্ক পুশকাস। ১৯৫৬ পর্যন্ত ৮৪টি আন্তর্জাতিক খেলায় হাঙ্গেরীর প্রতিনিধিত্ব করেছেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্যে হাঙ্গেরীর এই বিশ্ববিজয়ী খেলোয়াড় ইংল্যাণ্ডের ৯০ বছরের রেকর্ড ভাঙেন। নিজের দেশে যারা পরাজয় স্বীকার করেনি, ১৯৫৩-য় ওয়েমব্লি (ইংল্যাণ্ড) স্টেডিয়ামে পুশকাসের টীম সেই ইংল্যাণ্ডকে হারিয়েছিল। পরের বছর বুদাপেস্টে এদের কাছে ইংল্যাণ্ড হারে ৭—১ গোলে। হাঙ্গেরী অতঃপর আরও বিখ্যাত। ইংল্যাণ্ডে রব উঠল হাঙ্গেরীয়ান পদ্ধতিতে ফুটবল খেলতে হবে। কেননা, এর কিছুদিনের মধ্যে ব্রাজিল, রাশিয়া, উরুগুয়ে, ইটালী, আফ্রিকা কোরিয়া প্রভৃতি দেশ হাঙ্গেরীর কাছে পরাস্ত হয়েছে।

অতঃপর কিসপেটের খেলোয়াড় দেশে অন্য সম্মানে ভূষিত। সামরিক বাহিনীর জুনিয়ার লেফটেন্যান্ট হলেন মেজর। কিন্তু কিসপেট ক্লাবের নাম বদলে গেল। দলের খেলোয়াড়রা দুমাসের মধ্যে সামরিক বাহিনীর লোক হয়ে গেলেন। আট সপ্তাহের ট্রেনিং এ সকলেই অফিসার। কিসপেটের নাম পালটে রাখা হল 'হনভেড'। হনভেড হাঙ্গেরীর আর্মি টীম।

কিন্তু ১৯৫৪-য় বিশ্বকাপ হাঙ্গেরীর ঘরে গেল না। অথচ ১৯৫২ অবধি কেন, বিশ্বকাপের ফাইন্যালের আগের দিন পর্যন্ত হাঙ্গেরী জিতবে এমন ধারণাই ছিল। '৫২-য় হেলসিঙ্কি ওলিম্পিকে স্বর্ণপদক পেল হাঙ্গেরী। ১৫৪-য় বিশ্বকাপের সেমিফাইন্যালে ব্রাজিলের মত দুর্ধর্ষ টীমকে হারাল। ফাইন্যালে পুশকাস প্রথম গোল দিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। পশ্চিম জার্মানী ৩-২ গোলে বিজয়ী হল। পুশকাস শেষেও একটি গোল দিয়েছিলেন। তবে অফসাইড হওয়ায় তা নাকচ হয়ে যায়। পুশকাসের ঐ গোল নিয়ে সেবার বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। আসলে ওটা নাকি অফসাইড ছিল না। অবশ্য রেফারী লিনজ বলেন, অফসাইড, ক্লিন অফসাইড। মাঠ বা টেলিভিশন দর্শকরা অন্য মত দেন – মোটেই অফসাইড নয়।

এল ১৯৫৬। হাঙ্গেরীতে হল বিদ্রোহ। পুশকাস দেশ ছেড়ে চলে গেলেন। হাঙ্গেরীর আবেদনে 'ফিফা' পুশকাসকে সাসপেণ্ড করলেন। দুবছর তাই ভবঘুরে হয়ে কখনও ইতালী, কখনও বা ভিয়েনায় গিয়েছেন পুশকাস। অতঃপর ফিফা তাদের আদেশ প্রত্যাহার করলে তিনি যোগ দেন রিয়াল ম্যাড্রিদে।

৯ বছর হল ফেরেঙ্ক পুশকাস মাতৃভূমি ছেড়েছেন। কিন্তু দেশের কথা মনে পড়লেই তার মন কেমন করে। কথায় কথায় বলে ফেলেন, আমাদের সঙ্গে হলে দেখিয়ে দিতুম! এই "আমাদের" অর্থ হাঙ্গেরী।

ফেরেঙ্ক পুশকাসের কাছে সব চাইতে প্রিয় ফুটবল। আর মাঠে নেমে গোল দিতে পারলে ভাবেন সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়েছে। আত্মজীবনীতে 'গোল'-এর কথা তিনি বারংবার উল্লেখ করেছেন। আজও 'গোল' শব্দটি শুনলে তার স্মৃতিপটে অনেক কথাই ভেসে ওঠে। হ্যাম্পডেন পার্কে আন্তর্জাতিক খেলার কথা, ওয়েমব্লিতে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম গোল আর তারপর দর্শকদের গগনবিদারী চীৎকার, বুদাপেস্ট স্টেডিয়ামের উল্লাস ইত্যাদি। বাঁ পায়ের দিকে আজও নজর। ওঃ কত শট যে মেরেছেন। কত গোল দিয়েছি।

শুধু যশ নয় ; বিপুল অর্থের অধিকারী ফেরেঙ্ক পুশকাস। ১৯৫৬-য় দেশ ছেড়ে চলে আসার সময় বন্ধুবর কুবালা-র কাছে যিনি টাকা ধার নিয়ে এসেছিলেন, আজ ম্যাদ্রিদে একটি কারখানার প্রোপ্রাইটর, সমুদ্রের কাছে নিজের বাড়িতে বসবাস করেন। সম্প্রতি একটি বড় হোটেলও খুলেছেন সী বীচে।

অধিনায়ক ববিমুর

"জিতে আমরা আমাদের সমর্থকদের ঋণ শোধ করলাম"।

বিশ্বকাপ বিজয়ের পর গতবার (১৯৬৬) ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক ববি মুর কথা কটি বলেছিলেন। এদের ১০৩ বছরের ফুটবল ইতিহাসে গৌরবময় অধ্যায় ১৯৬৬-র আগষ্ট। বর্ষণস্নাত ওয়েমব্লি-র মাঠে পশ্চিম জার্মানীকে ৪-২ গোলে হারিয়ে ইংল্যাণ্ড এই প্রথম বিশ্বকাপ বিজয়ী হল। সুতরাং ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ববিমুর স্বভাবতই গৌরবান্বিত।

মাত্র পঁচিশ বছরের জীবনে কোন মানুষ বোধহয় এমন গর্ব অনুভব করতে পারেন না। তাছাড়া ফুটবলেও দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, এমন কথাই বা বলি কি করে! কয়েকবছর আগের কথা। স্কুলের ছাত্রাবস্থায় ববি ফুটবলের চাইতে ক্রিকেট ও অ্যাথলেটিকসে অধিক পারদর্শী ছিল। শেষবার তো ইংল্যাণ্ডে-স্কুল ক্রিকেট দলেরই অধিনায়ক! ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড় নির্বাচক সমিতির চেয়ারম্যান (এসেক্সএর অধিনায়ক) ডগ ইনসোল চেয়েছিলেন মুর এসেক্সে খেলবে। ওদিকে ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড থেকে আমন্ত্রণ এল ফুটবল খেলার। মুর শেষেরটিকেই বেছে নিয়েছিল সেদিন। (ভাগ্যিস ফুটবলে এসেছিলেন!)

নইলে ক্রিকেটেই তাকে দেখতে হত। ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি লম্বায় ইংল্যাণ্ড ও ওয়েস্ট হ্যামের এই ক্যাপ্টেন ১৮বার ইংল্যাণ্ড যুব একাদশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। অধিনায়ক হয়েছিল (বিশ্বকাপ ফাইন্যাল পর্যন্ত) ১০৫টি খেলার। মুর ইংল্যাণ্ডের জাতীয় দলের ক্যাপ্টেন ১৯৬৩ থেকে মাত্র ২৩ বছর বয়সে। আহত জিমি আর্সফিল্ড গভীর বিশ্বাসে মুর-এর হাতে সকল দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। ইংল্যাণ্ডের টীম ম্যানেজার আলফ রামসের নির্বাচনও যথার্থ বলতে হবে। কেননা মুর তবু ক্যাপটেন নন একজন সেরা হাফ ব্যাক। রামসে বলেছিলেন, "শুধু ক্যাপটেনের শক্তিতে শক্তিধর নয়, খেলতে খেলতে সঞ্চিত অনেক অভিজ্ঞতা আজ তার মধ্যে। এই বয়সে ফুটবলের সকল গুণের এমন সমন্বয় কদাচ চোখে পড়ে। মাঠে নেমে খেলার গতিপ্রকৃতি বুঝে ববি নিজের দল পরিচালনা করতে পারে। এটা অস্বাভাবিকও নয়, কারণ তরুণরাই তো সমাজের আলোকবর্তিকা"!

ওয়েস্ট হ্যামের ম্যানেজার রণগ্রীনউড এর উক্তিও প্রণিধানযোগ্য! ববি আজ তবু টীমের নয় মাঠের মধ্যেও 'বস'।

যেমন চেহারা, তেমনি রং। প্রশস্ত ললাট। ধীরে ধীরে মেপে কথা বলেন। মাঠে মেপে বল মারার মতন। "সরলতাই সাফল্যের কারণ। সে খুব উচ্চাকাঙ্খী নন, তাই খ্যাতির সোপানে।"

মুর ফুটবলকে জটিল করতে চান না। "সহজ ভাবে খেল, দ্রুত খেল"—এই তাঁর আদর্শ। স্বর্গতঃ ডানকান এডওয়ার্ডের পর তাই ইংল্যাণ্ডের ফুটবল মঞ্চে এমন শিল্পীর আবির্ভাব হয়নি। মাঠের বাইরে তার কাজ অন্য। অধিনায়কত্ব তার যেন জন্মগত অধিকার। কিন্তু কয়েক বছর হল কোচিং-এ তার ঝোঁক। এফ. এ সার্টিফিকেটও অর্জন করেছেন এজন্য।

ফুটবলে ববি মুরের আবির্ভাব হঠাৎ নয়। অপরিসীম পরিশ্রমের ফলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন। ১৯৫০-এর কথাই বলি। সেবার ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড পনের বছরের ছেলেদের নিয়ে কোচিং স্কীম

করেছিল। ববি সুযোগ পেল অনেক পরীক্ষার পর। ফুটবল কোচিং, কিন্তু পড়াকে বাদ দিয়ে নয়। স্কুলের পড়া যেন এখানে এসে আরও কড়া। সবই বিনাবেতনে। পুরো দুবছরের ট্রেনিং নিয়ে মুর যখন বেরুল তখন প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়। এবং তারপরই পেশাদারী। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি ঐ ট্রেনিং এর সময় ফুটবলের চাইতে সঙ্গীত ও ফরাসী ভাষায় অধিক আগ্রহী ছিল।

কিন্তু ওয়েস্ট হ্যামে বড়দের দলে খেলা সুরু থেকেই ববি ওসব প্রায় ভুলেই গিয়েছে। প্রতিপক্ষের পা থেকে বল কেড়ে নিয়ে কিভাবে ওদের হারান যায়—ববিমুর নিত্য সেই গবেষণাই করেন।

বিশ্বকাপ বিজয়ী ইংল্যাণ্ডের এই অধিনায়ক ফুটবল থেকে প্রতি সপ্তাহে আয় করেন একশ' পাউণ্ড। তার দলপরিবর্তনের খরচ লক্ষ টাকার ওপর।

হেলমুট রান

ইংল্যাণ্ডের স্ট্যানলী ম্যাথিউজ, হাঙ্গেরীর ফেরেঙ্ক পুশকাস, স্পেনের ডি. স্টিফানো, ব্রাজিলের পেলে ও রাশিয়ার ইয়াসিনের মত পশ্চিম জার্মানীর কারুর নাম করতে গেলে অনিবার্যভাবে হেলমুট রান এসে পড়েন।

কিন্তু এমন খেলোয়াড়ও মাত্র ৩৬ বছরেই ফুটবল থেকে বিদায় নিলেন। আর পেশাদারী ফুটবলে নামবেন না। সংবাদপত্রের ছোট্ট খবরে প্রকাশ, হাঁটুতে আঘাত লাগায় তিনি অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আঘাত কিন্তু মোটেই মারাত্মক নয়। তথাপি রান তার সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। ফুটবল রসিকরা তার খেলা দেখা থেকে

বঞ্চিত হলেন বটে, কিন্তু বিভিন্ন টীমের খেলোয়াড়রা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন। কেননা, আর তার সম্মুখীন হতে হবে না।

হেলমুট রান কত বড় খেলোয়াড় তার প্রমাণ বিখ্যাত কার্টুনিষ্ট কোপার আঁকা ছবি। তার ছবিতে দেখেছি হেলমুটের গলায় লরেল, মাথায় মুকুট। মুকুটের ওপর রাখা হয়েছে ফুটবল। কেউ কেউ বলেন, হেলমুট জার্মানীর ফুটবলে মুকুটহীনসম্রাট। একাধিপতি এক দশকেরও অধিককাল।

অধিকাংশের মত এই আউট সাইড রাইট বল পেলেই স্কোর করার চেষ্টা করতেন। কিন্তু প্রায়ই দেখা গিয়েছে রানের বল বিপক্ষরা ছিনিয়ে নিয়েছে। গোলে বল মেরেছেন, বারের ওপর দিয়ে চলে গিয়েছে, কখনও বা বারে লেগে ফিরে এসেছে। হেলমুট রান মুষড়ে পড়েন নি। অফসাইড হয়েছে, রেফারীর হুইশ্‌ল বেজে উঠেছে—রান হাসিমুখে আবার পজিশান নিয়ে দাঁড়িয়েছেন। এরই মাঝে পুনরায় দেখা গেল—হেলমুট তীরগতিতে ছুটে চলেছেন বল নিয়ে। বিপক্ষের ব্যূহ ভেদ করলেন। বল প্রবেশ করল গোলে—সঙ্গে সঙ্গে রেফারীর দীর্ঘ হুইশল। রানের তীব্র সটে জাল ছিঁড়ে গিয়েছে, এমন ঘটনাও কম নয়। পায়ে এমন অমিতশক্তি রয়েছে জেনেও তিনি ড্রিবলিং করতেন কেন, তা নিজেও জানতেন না। অথচ ড্রিবলিং না করলেই হয়তো গোলের সংখ্যাবৃদ্ধি হত।

১৯৫৪-য় বার্ণ-এর সেই ঘটনাটাই বলি। বিশ্বচ্যামপিয়নশীপস-এর খেলায় সেবার পশ্চিম জার্মানী হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে ৩-২ গোলে বিজয়ী হয়েছিল। জার্মানীর পক্ষে জয়সূচক গোলটি দিয়েছিলেন রান। সেই মুহূর্তে রান এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলেন যে, বল গোলে যাওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। কিন্তু বাঁ পায়ে সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন। পুশকাসের হাঙ্গেরী হেরে গেল। জুলে রিমে কাপ চলে গেল জার্মানীতে। ঐ খেলার সুরুতে কিন্তু হাঙ্গেরীই এগিয়েছিল। তারাই গোল দেয় প্রথম। কিন্তু জার্মানীর নব নব ক্রীড়াশৈলীর কাছে

সব ব্যর্থ হয়েছিল। শেষের ঐ জয়সূচক গোলের জন্য পরদিনের সংবাদপত্রগুলিতে হেলমুট রান হয়েছিলেন 'হিরো অফ বার্ণ'।

ঐ খেলার পর দু'তিনবছর জার্মানীর খেলা একটু পড়ে গেলেও ১৯৫৮-র বিশ্বচ্যমপিয়নশীপসের (সুইডেন) খেলায় রানকে আবার 'টপ ফরমে' দেখা যায়। সেবার পশ্চিম জার্মানী জিততে পারেনি। তাদের স্থান হয়েছিল চতুর্থ। কিন্তু হেলমুট রান একলাই ৬টি গোল দিয়ে সুইডেনে 'বেস্ট উইঙ্গার' হন। জার্মানীর পত্র পত্রিকাগুলি ঐ সময় লেখে—"রাণ না থাকলে এবার জার্মানীর কোন পাত্তাই থাকতো না।"

বিশ্বফুটবলে হেলমুট রানকে অতঃপর আর দেখা যায় নি। ১৯৬২তে অনুপস্থিত ছিলেন।

এসেক্স-এর এই ছেলে একটি সুবার্বন ক্লাবে (রট ওয়াইজ) ফুটবল সুরু করেন। তারপর যান এ. সি. কোলন দলে। প্রথম শ্রেণীর ফুটবল সুরু মাত্র সতের বছর বয়সে। পশ্চিম জার্মানীর জাতীয় দলের হয়ে ৪০টি আন্তর্জাতিক খেলায় যোগ দিয়েছেন। জাতীয় দলে খেলতে গিয়ে গোল দিয়েছেন ২১টি। এ কারণে কোচ হারবারজারের কাছে হেলমুট রান সব চেয়ে ঋণী। কারণ এরই প্রচেষ্টায় রান জাতীয় দলে খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন।

তিনবছর ছিলেন হল্যাণ্ডের এস. ভি. ইউশেডে। জার্মানীতে ফিরলেন তেষট্টিতে। প্রথমে যোগ দেন ব্যাণ্ডেসলিঙ্গায়, তারপর ডটমুণ্ডের মেডরিক এস. ভি. তে। হাঁটুর আঘাতের জন্য চুক্তি বাতিল করলেন। আজও তাকে জিজ্ঞাসা করলে বলেন, "না, আমি আর ফিরছিনা।" তাছাড়া পেশাদারী খেলারই বা কি প্রয়োজন। এককার সেরা ফুটবল খেলোয়াড় পুরোন মোটরগাড়ি বিক্রীর ব্যবসায়ে হাত দিয়ে বেশ পসার জমিয়েছেন।

তৎসত্ত্বেও মেডরিক এস. ভি. তাকে পেনসন দেওয়ার জন্য প্রদর্শনী ম্যাচের আয়োজন করেছিল। তবে ওটা আর্থিক সাহায্যের জন্য নয়।

বলা হয়েছিল—"এটা মহান খেলোয়াড়কে মনে রাখার উপায় মাত্র। তার জীবনের গৌরবময় অধ্যায়ের প্রতি এটা হল শ্রদ্ধা প্রদর্শন।"

কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি হেলমুট রানের জন্য প্রদর্শনী ম্যাচই হোক, তিনি খেলুন আর নাই খেলুন শুধুমাত্র ১৯৫৫-য় বার্নের গোলটির জন্য তিনি অমর হয়ে থাকবেন।

এমারিখ

কেউ বলেন "পেনাল্টি এরিয়া স্পুক" কেউবা 'গোল হাণ্টার'। পশ্চিম জার্মানীর এই খেলোয়াড় কিন্তু এসব বিশেষণে খুশি নন। বলেন, "এতে আমার কৃতিত্ব বেশি নয়। স্কোরার হিসেবে কেউ আমার প্রশংসা করলে তার অর্ধেক বা বেশির ভাগ প্রাপ্য বন্ধুবর সিগি হেল্ডের। আমি ফিনিশিং টাচ দিই মাত্র।

লোথার এমারিখ নিজের সম্পর্কে যাই বলুন না কেন, তাঁর খেলা যাঁরা দেখেছেন তারা এমারিখের তারিফ না করে পারবেন না। ফুটবল 'সিঙ্গলস' খেলা নয় তাই এমারিখের বক্তব্যও নাকচ করা যায় না। তাছাড়া কো-অপারেশন ইজ দ্য পাথ। গত মরসুমে ইউরোপীয় কাপ ও বিশ্বকাপের খেলাগুলোর এমারিখ গোলদাতা হিসেবে যে খ্যাতি অর্জন করেছে, পশ্চিম জার্মানীর ফুটবল ইতিহাসে তা বিরল। ফুটবল রসিকরা যথার্থ ই বলেছিলেন—ডটমুণ্ডের এই খেলোয়াড় সোনার পা নিয়ে এসেছেন।

ইওরোপীয়ান কাপ বিজয় হামবুর্গের বোরাসিয়া ডটমুণ্ডের দেওয়া ২৭টি সোলের মধ্যে একা এমারিখ দিয়েছিলেন ১৪টি। কোয়ার্টার ফাইন্যালে আটলেন্টিকো ম্যাড্রিদের বিরুদ্ধে ১-১ এবং পরে ১-০।

দুটি গোলই এর দেওয়া। ওয়েস্টহ্যাম ইউনাইটেড-এর বিরুদ্ধে দুটি গোল, দ্বিতীয় খেলায় ওয়েস্টহ্যামকে পরাজিত করার সর্বাধিক কৃতিত্ব এর। কিন্তু এমন স্কোরার গ্লাসগোয় ইওরোপীয় কাপের ফাইন্যালে ব্যর্থ মনোরথ। এমারিখ একটি গোলও করতে পারেন নি। এতসত্ত্বেও এমারিখের জনপ্রিয়তা কমেনি।

খেলার মাঠে নেমে এমারিখ কখন যে অঘটন (গোল) ঘটিয়ে ফেলে কেউ সে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন না। একবার তো ব্যাক হেডএ এগার গজ দূর থেকে একটি গোল দিয়েই খেলার জয় পরাজয় নির্ধারণ করেছিলেন। যেমন ভাল পা, তেমনি বাঁ। হাঁটু, গোড়ালি সবই সমান।—যে কোন জায়গায় বল এলেই হল। লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না।

জন্ম : ১৯৪১-এ। বোরাসিয়া ডর্টমাণ্ড ক্লাবে এসেছেন ১৯৬১ তে। সুরুতে গোলদাতা হিসেবে এমারিখ মোটেই খ্যাত ছিলেন না। কোন রকমে জোড়াতালি দিতেন। এমারিখের স্থান ছিল তৃতীয়। কিন্তু দুজন ফরোয়ার্ড বোয়াসিয়া ছেড়ে চলে গেল। তারপর থেকেই এমারিখ প্রথম। এম্মা সর্বোচ্চ গোলদাতা—টপ স্কোরার। "বি. ভি. ডস্টসেল্ড ০৯" ক্লাবে যার খেলা সুরু বোরাসিয়ায় এসে সে কৃতী হল।

ফ্রেডহেলম কোনিয়েণ্টকা গেলেন মিউনিখ আর ফ্রাঙ্ক দাগস নুরেমবার্গে। এমারিখ অতঃপর মধ্যমণি।

গোল না দিতে পারলে এম্মা আগে গোমড়ামুখো হতেন। এমন কি প্রাণের বন্ধু সিগির সঙ্গেও বাক বন্ধ থাকতো। কিন্তু এম্মার এখন সর্বদা হাসিমুখ। জিতলে হাসি, হারলেও হাসি।

কে তোমার বড় বন্ধু ? জিজ্ঞেস করলেই এম্মা বলেন—ফুটবল।

—তারপর ?

—সিগি হেল্ড।

সত্যিই সিগি হেল্ড ছাড়া যেমন লোথার এমারিখকে ভাবা যায় না, তেমনি এমারিখকে ছেড়ে সিগিকেও নয়। এম্মার খেলা ও বিশেষ করে গোল দেওয়া যাঁরা দেখেছেন, তারা জানেন গোল দেওয়ার পরই

তিনি ছুটে যান কর্ণার ফ্লাগের কাছে। হাজার হাজার দর্শকের অভিনন্দন গ্রহণ করেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত এমন কোন ঘটনা কখনও ঘটেনি যে, সিগি-র কাছ থেকে অভিনন্দনের আগে এম্মা জনতার অভিনন্দন নিতে দৌড়ে গিয়েছে।

পশ্চিম জার্মানীর জাতীয় দলে লোথার এমারিখ এখন শ্রেষ্ঠ আউটসাইড লেফট। জার্মানীর ফুটবলে এমারিখকে 'জ্যোতিষ্ক' আখ্যা দিলে অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু এ খেতাব দু জনকেই দেওয়া উচিত। ওর বন্ধু সিগিকেও।

"হি ইজ দ্য" ফাস্টেস্ট "এ্যাণ্ড ইম্মা দ্য গ্রেটেস্ট"।

দুর্ভেদ্য প্রাচীর গর্ডনব্যাঙ্কস

কর্মজীবনে এসে সকল স্বপ্ন বিলীন হল। স্কুলের গোলকীপার যখন রাজমিস্ত্রীর এ্যাপ্রেনটীসসীপ নিল তখন ওতেই কি করে ভাল ফল দেখান যায়—এই ছিল লক্ষ্য; আর ফুটবল স্মৃতি। একদিন কিছুই ভাল লাগছিল না। কি করা যায় ভেবে ভেবে সারা হল। অবশেষে ঠিক করল ফুটবল মাঠে যাওয়ার। চেষ্টারফিল্ডে একটা ছোট খেলা। প্রতিদ্বন্দী দুটি দলই মাঠে উপস্থিত। খেলা হতে আর বিলম্ব নেই। কিন্তু সুরুর আগে বিপাক দেখা দিল। একটি দলের গোলকীপার অনুপস্থিত। খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেল—গোলকীপার পাওয়া যায় কোথায়?

গ্যালারীতে বসে থাকা অনেকে একটি ছেলের প্রতি নজর দিচ্ছিল বারে বারে। গোলকীপারের ভূমিকায় একে বহুবার দেখা গিয়েছে। ওরও ইচ্ছে হচ্ছিল খেলার। অবশেষে জনৈক দর্শক অনুপস্থিত গোলকীপারের দলকে গিয়ে ওর কথা বললেন। বললেন গর্ডন ব্যাঙ্কস

বসে রয়েছে। পরের ঘটনা স্বাভাবিক ! ব্যাঙ্কসও রাজি হয়ে ছিলেন। চেষ্টারফিল্ডের হয়ে গর্ডন ব্যাঙ্কস সেদিন দারুণ খেলেছিল।

ব্যাঙ্কস অতঃপর আবার খেলোয়াড়। রাজমিস্ত্রীর শিক্ষানবিসীর অবসরে ফুটবলে তালিম তার নিত্যক্রিয়ার মধ্যে। কিন্তু তাও যেন সইল না। ১৯৫৬-য় সাময়িক বাহিনীতে যোগ দিল। চলে গেল জার্মানী। ১৭ বছরের ছেলে এখানে এসেও ফুটবলকে ভোলেনি। সুযোগ পেলেই বল নিয়ে মাঠে নেমে যেত। ছোট ছোট মাঠেও খেলত নিয়মিত ভাবে। আর ছুটি পেলেই চলে যেত চেষ্টারফিল্ডে। একদিকে ফুটবল অন্যদিকে চাকরি। একটির প্রয়োজন রুটির জন্য। অন্যটি মনের জন্য। অনেক ভাবল এবং অবশেষে চাকরিই ছাড়ল। দেখল খেলেই তো রোজগার করা যায় ! সুতরাং দু নৌকায় পা রেখে কি লাভ ! যোগদিল লিষ্টার সিটিতে। গর্ডন ব্যাঙ্কস তারপর থেকেই পেশাদার ফুটবল খেলোয়াড়।

সামরিক বাহিনীতে যোগদানের আগে এফ. এ, ইয়ুথ কাপে গর্ডনের খেলাও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু লিষ্টারের পয়লা নম্বর গোলকীপার হতে তার অনেক সাধনা করতে হয়েছে। ব্যাঙ্কস সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত মাঠে গিয়ে তবু বল ধরা প্র্যাকটিশ করেছে কতদিন তার ইয়ত্তা নেই। সতীর্থরা কেউ নেই ? অন্যকে ডেকে এনেছেন পয়সা দিয়ে, শুধু গোলে বলমারার জন্য।

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় প্রথম অংশ গ্রহণ ২৩ বছরের আগেই। ডেনমার্কের বিরুদ্ধে খেলেছিলেন সেবার। ঐ খেলার সাফল্যই ব্যাঙ্কসকে বিশ্বকাপে (১৯৬২) খেলার সুযোগ করে ছিয়েছিল।

লিষ্টার এর ম্যানেজার গত বিশ্বকাপের পর স্মৃতি চারণ করে বলছিলেন—আমরা যোগ্যতমকেই আবিষ্কার করেছিলাম—জানতাম ও একদিন ইংল্যাণ্ডের মুখোজ্জ্বল করবে।

৮৮ কিলো ওজন। লম্বায় ৬ ফুট ১ ইঞ্চি। দূর বা কাছ থেকে দেখলে স্বভাবতই মনে হয় ব্যাঙ্কস এতৎসত্ত্বেও চলাফেরা করেন কি

করে! কিন্তু ১৯৬৩-তে স্কটল্যাণ্ড ইংল্যাণ্ড ম্যাচেই প্রমান দিয়েছিলেন দেহভার কিছুই নয়। হঠাৎ ফিষ্ট ডাইভ ইত্যাদি তার জুড়ি নেই। ওর পরই গর্ডন ব্যাঙ্কস ইংল্যাণ্ডের একনম্বর গোল রক্ষক। এ পর্যন্ত ৩২ বার ইংলণ্ডের হয়ে খেলেছেন। বড় বড় খেলায় ৩০০ বারেরও বেশি নিশ্চিত পরাজয় থেকে দলকে রক্ষা করেছেন।

গত বিশ্বকাপের (১৯৬৬) লীগের তিনটি খেলাতে তার বিরুদ্ধে কেউ গোল দিতে পারে নি। একটি নক আউটেও না। সেমিফাইন্যালে পোর্তুগাল দিয়েছিল পেনাল্টিতে একটি ও ফাইন্যালে পশ্চিম জার্মানী দুটি। ফলছিল ইংল্যাণ্ড ৪। পশ্চিম জার্মানী-২। অবশ্য এই তিনটি গোলের জন্য গর্ডনকে দায়ী করা চলে না। গর্ডন ব্যাঙ্কসকে নিছক অর্থে গোলকীপার বললে ভুল হবে। ইংল্যাণ্ডের তিনি আজ দুর্ভেদ্য প্রাচীর।

একদা যে তরুণ রাজমিস্ত্রীর কাজ ছেড়ে ফুটবলে মনোনিবেশ করেছিল আজ সেই নেশা তাঁর পেশা। বছরে রোজগার পাঁচ হাজার পাউণ্ড। ক্লাবের বাড়িতে থাকেন। নিজেই করটিনা গাড়িখানা চালান। বিয়েও করেছেন! শ্বশুরবাড়ি পশ্চিম জার্মানী। সামরিক বাহিনীতে কাজের সময় ওর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল।

উয়ে সিলার

"রোস রোস, অত উচ্ছ্বাসের কি আছে, তিষ্ঠ ক্ষণকাল দেখবে এ খেলা খেলাই নয়। উয়ে বড় হোক, দেখবে খেলা কাকে বলে।"

প্রায় বিশ বছর আগে আরউইন সিলার ভবিষদ্বাণী করেছিলেন নিজের ছেলে সম্পর্কে। ১৯৪৭-র সেদিন ব্রিটিশ জোনাল ফুটবল চ্যামপিয়ন-শিপের ফাইন্যালে বোরাশিয়া ডটমুণ্ড ও হামবুর্গ এস. ভি-র

খেলায় হামবুর্গ ১-০ গোলে জিতেছিল। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর বিজয়ী খেলোয়াড়দের সে কি হৈ চৈ! স্কোরার না হলেও আরউইন ছিলেন সেদিনকার সেরা খেলোয়াড়। তাই তাঁকে কেন্দ্র করে আনন্দটা যেন আরও জমেছিল।

আরউইনের ছেলের বয়স তখনও এগার পূর্ণ হয়নি। কিন্তু কিশোর ছেলের শটে বাবা ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতেন, মাঠে নেমেও একটি কথাই বারংবার মনে উদিত হত—কবে আমার উয়ে বড় হবে, কবে সে আমার চাইতেও উঁচু দরের খেলোয়াড় হবে!

সত্যি সত্যিই উয়ে একদিন বড় হল। বয়স' তখন মাত্র সতের। তবুও বড়। অনেকের চাইতে বড় ফুটবলার। মিউনিখ থেকে হামবুর্গ রাতারাতি খ্যাত হল উয়ে সিলার। ১৯৫৩ ও ১৯৫৪-য় পশ্চিম জার্মানীর এই সেণ্টার ফরোয়ার্ড ন্যাশনাল বয়েজ টীমের হয়ে ১৫টি গোল দিয়েছিল। ১০টি খেলায় ১৫টি গোল আজও উয়ে-র স্মৃতি—চারণ। কৈশোরের শুভসূচনা আজ যৌবনের সিলারের মধ্যেও অব্যাহত।

সতের বছরের ছেলের সকল দায়িত্ব স্কন্ধে নিয়েছিলেন "ফাদার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড চ্যামপিয়নশিপ" মিঃ সেপ হারবাগার। ১৯৫৪-র ১৬ই অক্টোবর উয়ের কাছে আরও স্মরণীয়। সেই প্রথম এই বিশ্ববিজয়ী খেলোয়াড় ফ্রান্সের বিরুদ্ধে পশ্চিম জার্মানীর জাতীয় দলে খেলার সুযোগ পায়। হ্যানোভারে অনুষ্ঠিত খেলায় জার্মানী কিন্তু জিততে পারেনি। ৩-১ গোলে হেরে গেল। অথচ এর তিনমাস আগে বিশ্বকাপে জার্মানী বিজয়ী হয়েছিল। স্বভাবতই নবাগতের মন ভেঙে গেল। কেউ কেউ ওর ওপর দোষ চাপিয়ে দিল। বললেন, "উয়েটা অপয়া"। কেউবা—"এটা তোমার সবচাইতে বাজে খেলা"।

সত্যিই উয়ে নাকি সেদিন ভীষণ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিল। তাই ১৯৫৫ ও ১৯৫৬-য় পশ্চিম জার্মানীর ফুটবল মঞ্চ থেকে উয়ে প্রায় অন্তর্হিত। দু'বছরে মাত্র দুটি ম্যাচ খেলেছিল জাতীয় দলের হয়ে। ১৯৫৮-য় বিশ্বকাপে যাওয়ার আগে এই-ই তার বড় খেলা। কিন্তু

হঠাৎ যেন একলাফে সবার ওপরে উঠে গেল উয়ে সিলার। সিলারের সতীর্থ অবশ্য এ অস্বীকার করেছে। তার বক্তব্য : দিবারাত্র অনুশীলন আর হারবার্জারের কোচিং-এর গুণে উয়ে সিলার এক লাফে উঠে এসেছে। তাঁর খেলার মান এত উঁচু হল যে ১৯৬৩তে ফিফার নির্বাচন লাভ করলেন। বিশ্বদলের এই খেলোয়াড়কে ইউরোপীয় দলেও দেখা গেল। বেলগ্রেডে যুগোশ্লাভিয়াকে এরা যে ৭টি গোল দেয় তার দুটি হয়েছিল সিলারের বুটের ঘায়ে। কিন্তু তার দেওয়া সেরা গোল সম্ভবত ১৯৬৫-র সেপ্টেম্বরে স্কটহোম শহরে। সুইডেনের সঙ্গে ২-১ গোলে জিতে পশ্চিম জার্মানী ইংল্যাণ্ডে গতবার বিশ্বচ্যামপিয়নশিপস খেলার গৌরব অর্জন করে। এই খেলাটি অন্যকারণেও সমধিক উল্লেখযোগ্য। কেননা, সিলার খেলতে পারবেন– এমন ধারণা তিরোহিত হয়েছিল। পায়ের শিরা ছিঁড়ে যাওয়ায় তিনি কয়েকমাসের পূর্ণবিশ্রামে ছিলেন। কোনদিন যে ফুটবল খেলতে পারবেন—এ সন্দেহও দেখা দিয়েছিল।

২৯ বছর বয়স্ক এই সেণ্টার ফরোয়ার্ডের বিশেষত্ব : যে কোন পজিশান থেকে দু পায়ে বিদ্যুৎ বেগের শট করতে পারেন। তারও চাইতে দেখার বিষয় তাঁর হেড।

পশ্চিম জার্মান 'অলটাইম' তালিকায় সিলারের স্থান এতকাল পঞ্চম ছিল। তার আগে যথাক্রমে জেনস (৭১), লেনার (৬৫), ওয়ালটার (৬১) ও এর হার্ড (৫০) গতবিশ্বকাপে যোগদানের পর সিলার হয়েছেন চতুর্থ। আন্তর্জাতিক খেলায় অংশগ্রহণের সংখ্যা আরও বেড়েছে।

সিলার আজ ফুটবলেও যেমন প্রতিষ্ঠিত, তেমনি ব্যক্তিগত জীবনে ঘোর সংসারী। দুই সন্তানের পিতা, একটি বাড়ির মালিক জার্মানীতে 'স্পোরটস সু'-এর জেনারেল এজেণ্ট। উত্তরাঞ্চলে একটা পেট্রোল পাম্পও আছে।

হেলমুট শ্যোন

১৯৩৬ থেকে ১৯৬৪ অবধি শেপ হারবারগার পশ্চিম জার্মানীর জাতীয় দলের 'প্রধান' ছিলেন। দল নির্বাচন এবং তাদের ট্রেনিং-এর সকল দায়িত্ব ছিল হারবারগারের ওপর। বিশ্ব চ্যামপিয়নশীপের চারটি টুর্নামেন্টেই 'প্রধান'-এর ভূমিকায় তাকে দেখা যায়। ১৯৫৪-য় বিশ্ব চ্যামপিয়শীপের পর খেলোয়াড়রা তাঁকে ডাকতেন 'চীফ' বলে। কিন্তু ১৯৬৪-৬৫-র সুরুতে ঐ 'চীফ'-এর দায়িত্ব বর্তায় হেলমুট শ্যোনের ওপর। হারবারগার-ই তাঁর নাম প্রস্তাব করেছিলেন।

ফুটবলের আসরে শ্যোন নবাগত নন। খেলোয়াড় জীবনে তিনবার জার্মানীর প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত ১৬টি আন্তর্জাতিক খেলায় নেমেছেন। ড্রেসডেন এস. সি-তে খেলার সময়ই ছিল হারবারগারের স্বর্ণ যুগ। তার জন্যই ১৯৪৩ ও ১৯৪৪-এ ঐ টীম জার্মানীর চ্যামপিয়ন হয়েছিল। ১৯৪০-১৯৪১-এ জার্মান ফুটবল কাপ প্রাপ্তিও উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৭-এ সর্বপ্রথম বড় খেলায় নেমে হামবুর্গে সুইডেনের বিরুদ্ধে দুটি গোল দেন। জার্মানী সেবার ৫-০ গোলে জিতেছিল। ১৭টি খেলায় ১৬টি গোল দিয়েছিলেন।

যুদ্ধের পর থেকে ১৯৫৬ অবধি ছিলেন স্যারল্যাণ্ড ফুটবল এ্যাসোসিয়েশনের ম্যানেজার। ঐ সময় (১৯৫-৩৪) একটি মজার ঘটনা ঘটে। স্যারল্যাণ্ড একাদশের সঙ্গে বিশ্বকাপের খেলা সুইজারল্যাণ্ডে—জার্মানীর বিরুদ্ধে। হারবারগারের কাছে শ্যোন হারল ৩-৩ এবং ১-৩ গোলে। তারপর ১৯৫৬-তে হারবারগারের সুপারিশে প্রতিদ্বন্দ্বী শ্যোন-ই হলেন জার্মান ফুটবল এ্যাসোসিয়েশনের কোচিং স্টাফ। 'বি' টীম এবং ১৮ পর্যন্ত বয়সের খেলোয়াড়দের ট্রেনিং দেওয়ার ভার ছিল শ্যোনের। ১৯৫৮-য় সুইডেনে হারবারগারের সহকর্মী হলেন। ৬২-তে জাতীয় দলের সঙ্গে গেলেন চিলি। শ্যোনকে

এই ভাবে শনৈঃ শনৈঃ জার্মানীর জাতীয় দলের কোচিং-এর ভার দিয়েছেন।

জার্মানীতে এখন প্রবাদ—হেলমুট শ্যোন হচ্ছেন দ্বিতীয় হারবারগার। কেউ বলেন, গুরুর অনুকরণে চলেছেন শিষ্য। কিন্তু অন্যরা বলেন, না। তা নয়।

স্যাক্সণীর এই সন্তান আসছে সেপ্টেম্বরে বাহান্নয় পড়বেন। সুতরাং শ্যোন আজও হারবারগারের নকল করে চলেছেন—এ কথা বলা উচিত নয়। তাই বলে হারবারগারের কোন প্রভাব তার মধ্যে নেই-এও বলা যায় না। শ্যোন বলেন, "অমন কোচ্‌কে অনুসরণ করা ধৃষ্ঠতা। তবে একটি জাতীয় দলের ম্যানেজারের যা যা দায়িত্ব আছে, আমি সেই ভাবেই কাজ করে চলেছি"।

ফুটবলের তিনি একজন নিপুন শিল্পী। নিজের পরিকল্পনা আছে, ফুটবল নিয়ে চিন্তা করেন এবং তদনুযায়ী কাজ করতেও ভীত নন! আর তার যত সমালোচনাই হোক।

ছেষট্টির জুলাইয়ে ইংল্যাণ্ডের বিশ্বকাপের খেলা নিয়েও তিনি ভীষণ চিন্তা করেছেন। বিশ্বকাপে পশ্চিম জার্মানীর দল গঠনের জন্য তিনি নিচের প্রয়োজনগুলির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন :—

১ ভাল টেকনিক্যাল খেলোয়াড় প্রচণ্ড চাপের মুখেও দমবে না।

২ বল কেড়ে নিলেও পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করবে।

৩ দলের মধ্যে ট্যাকটিকাল পারদর্শিতা।

৪ শারীরিক অবস্থা এবং তার উন্নতিতে সক্ষম কি না।

দলের স্তম্ভ নির্মাণের জন্য অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দেরও নির্বাচিত করি। সীলার, স্থলজ এবং টিলকোউসকি ছিল পোক্ত স্তম্ভ। এছাড়া বোকেনবাউয়ারের মত খেলোয়াড়দের নিয়ে ভবিষ্যতের কথাও আমায় ভাবতে হয়েছিল। সর্বোপরি আমি এমন খেলোয়াড় চেয়েছিলাম, যারা নম্বরের বাঁধনে বাঁধা নয়, খেলার সিস্টেমও হবে স্বচ্ছন্দ। তাছাড়া টিম স্পিরিট আছে এমন খেলোয়াড়ও খুঁজে বার করা দরকার।

আমাদের লীগ যেভাবে খেলা হয়, তার সঙ্গে মানিয়ে চেষ্টা করি অনুশীলন ব্যবস্থার। দীর্ঘ দিনের ট্রেনিং ব্যবস্থার থেকেও দেখি স্বল্পকালের দুই থেকে চার দিনের নিয়মিত ব্যবস্থায় বেশি ফল পাওয়া যায়। লীগ ক্লাবগুলির ম্যানেজারদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলি, যাতে মাঝে দু-তিন দিনের জন্য খেলোয়াড়দের পেতে অসুবিধা না হয়।

শুধু মাঠেই নয়, বাইরেও যাতে খেলোয়াড়রা পরস্পরকে ভাল করে বুঝতে পারে তার চেষ্টাও করি।

বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত খেলোয়াড়দের সঙ্গে ট্যাকটিকস নিয়ে কোন কথা বলিনি। পরের খেলা নিয়েই আমরা সব সময় কথা বলতাম, বিশ্বকাপ নিয়ে নয়। আমি শুধু খুঁজতাম, সেই ধরণের খেলোয়াড় যে আক্রমণ ও রক্ষণ দুটি কাজই করে এবং কৌশলগত দিক থেকে ভাল।

বিশ্বকাপ বা এই ধরণের প্রতিযোগিতার রিজার্ভরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ টিম-স্পিরিট রক্ষিত হয়। এই জন্যই জার্মান ফুটবল এ্যাসোসিয়েশন যখন বোনাস মঞ্জুর করে প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ই তা পায়। অবশ্য বিশ্বকাপ শুরুর আগে তারা জানতই না যে কোন বোনাস পাবে। বস্তুত জাতীয় একাদশের হয়ে অ্যামেচার হিসেবেই ওরা খেলতে আসে দৈনিক এক পাউণ্ড ভাতায়। ফাইন্যালে ওঠার পরিশ্রম বাবদই ওরা বোনাস পেয়েছিল।

জার্মান ফুটবল মরশুম শেষ হয় জুনে, কাপ ফাইন্যালের সঙ্গে সঙ্গেই। বিশ্বকাপ দলের একাধিক খেলোয়াড় কাপের খেলায় ব্যস্ত ছিল! কাপ খেলার পর সব খেলোয়াড়কে ১১ দিনের ছুটি দেওয়া হয়। অবশ্য জিমন্যাসটিকস এবং হালকা খেলাধূলা সে সময় ওরা বন্ধ করেনি। ক্লাব থেকে দূরে পরিবারের সঙ্গে ক'দিন কাটিয়ে ফেরার পর ওদের শরীর পরীক্ষা করা হয়।

ট্রেনিং এবং দুটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার পর আটদিনের জন্য একটি জার্মান স্পোর্টস স্কুলে ট্রেনিং নেবার আগে ওদের তালিম বন্ধ রাখা হয়।

বিশ্বকাপে খেলার ছক নির্ধারণের সময় এলে আমি ৪-২-৪ ছককেই ঠিক করি। কিন্তু, ছকটি যেন অদল বদলের ধাক্কা সইবার মত হয়। ফুটবলে আগে খেলোয়াড় নির্বাচন করতে হয়। তারপর খেলোয়াড়দের উপযোগী ছক নির্বাচন। আগেই ছক নির্বাচন নয়। প্রত্যেক ম্যানেজারেরই দল গড়ার স্বতন্ত্র পদ্ধতি আছে। এটা হতেই হবে যেহেতু প্রত্যেক দেশ এবং খেলোয়াড়রা এক রকমের হয় না। কিন্তু আমি নিঃসন্ধিগ্ধ যে পদ্ধতি নিয়েছিলাম সেটা আমাদের দলের পক্ষে উপযোগী ছিল।

তিনি বলেন, ফাইন্যাল খেলার আগে জার্মান খেলোয়াড়রা পরস্পরকে আলিঙ্গন করে বলে,—আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করবই। এবং জানান, খেলতে যাবার সময় বাস থামিয়ে নেমে জার্মান খেলোয়াড়রা পনেরো মিনিট বল নিয়ে খেলা করে ওয়ার্ম আপহয়ে, তবে স্টেডিয়ামে যেত।"

জর্জ কোহেন

"ছোট হলেও কি হবে! ফুলহামের মত দলে থেকেই আমি উন্নতি করতে পেরেছি। খেলায় শুধু জয়ের জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করিনি। আমার সকল সাফল্যের মূলে এই ছোট টীমে থেকে কঠোর পরিশ্রম।"

অন্যান্য লীগের খেলার সময় মাঠে নামার আগে যেমন ঘাবড়ে যান, তেমনি বিশ্ববিজয়ী দলের রাইট ব্যাক জর্জ কোহেন গত বছর

বিশ্বকাপের ফাইন্যালেও দিশেহারা হয়েছিলেন। অবশ্য বিজয়ের পর বলেন, আমার সকল ভয় কেটে গিয়েছে।

আমাদের দেশে যেমন প্রদীপ ব্যানার্জী, ইংল্যাণ্ডে তেমনি জর্জ কোহেন। অপেক্ষাকৃত বড় টীমে খেলার সুযোগ পেয়েও প্রদীপ যেমন সকল প্রলোভনের ঊর্ধ্বে আছেন, ইষ্টার্ণ রেল ছাড়েন নি। তেমনি জর্জ কোহেন। বিশ্বফুটবলের খ্যাতিমান দল ম্যাঞ্চেষ্টার ইউনাইটেড। লীডস, লিভারপুল, এভার্টান ব্লাকপুল, টটেনহাম হসপার-র প্রভৃতিতে খেলে যশ ও অর্থের অধিকারী হওয়ার সহজ সুযোগ কখনও গ্রহণ করেননি। প্রত্যেকের আহ্বান নাকচ করে দিয়েছেন। স্কুল জাবন শেষে এখন থেকে এগার বছর আগে মাত্র ষোল বছর বয়সে তাই যে ছেলে ফুলহামে যোগ দিয়েছিল, আজ আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী হয়েও সে ঐ ফুলহাম ছাড়েনি। ফুলহাম কোহেনের কাছে যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারাণসী। সম্প্রতি বলেছেন, "মৃত্যুর আগে আমি ফুলহাম ছাড়ছি না।"

অথচ অর্থের প্রয়োজন যে তার নেই তা নয়। নিজের খেলার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কোহেন ফুলহাম কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। অবশ্য কখনও শোনা যায়নি—"টাকা না বাড়ালে অন্য ক্লাবে চলে যাবো"। প্রথম ডিভিশন লীগের খেলায় ফুলহামের স্থান সকলের নিচে চলে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে; কোহেন একাই চেষ্টা করে দলকে কোন রকমে বাঁচিয়ে রেখেছেন। ১৯৬৩-৬৪ সনে ইংল্যাণ্ডের জাতীয় দলের হয়ে দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়েছেন। কোহেন হয়েছেন আরও বিখ্যাত। অনেকে মনে করেছিলেন ফুলহামে আর এঁকে দেখতে পাওয়া যাবে না। কিন্তু জর্জ কোহেন 'অনেকের' সেই জল্পনা-কল্পনার ঊর্ধ্বে ছিলেন।

কোহেন তার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন। ব্রাজিলের স্যান্টোস কিংবা ইটালীর ব্যাক ফ্যাসেতির পাশাপাশি ফুলহামের এই কীর্তিমানকে রাখা যায়। ইটালী ও ব্রাজিল বিশ্বকাপ থেকে অনেক আগেই বিদায়

নিয়েছিল। কিন্তু কোহেনের মত দুর্ভেদ্য ব্যাকের জন্য সেমিফাইন্যাল পর্যন্ত চারটি ম্যাচে একটি বলও গোলে প্রবেশ করতে পারে নি।

ফুলহামের হয়ে এ পর্যন্ত ২০০-রও বেশি লীগ খেলেছেন। কিন্তু মনে রাখার মত খুব কম খেলাই খেলেছেন। মাত্র সাতাশ বছর বয়স হলে কি হবে!—পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি উচ্চতা, ওজন ৭০.৪ কিলো, প্রশস্ত ললাট দেখলে মনে হবে চল্লিশের কোঠায় পা দিয়েছেন।

১৯৬৩-৬৪-তে জিমি আর্মফিল্ডের অসুস্থতার জন্য কোহেন জাতীয় দলে খেলতে এসেছিলেন। সেই যে এলেন, এখনও রয়ে গেলেন। রাইট ব্যাকে স্থলাভিষিক্ত হওয়ার মত খেলোয়াড় আজও বিরল। বিশ্বকাপের মূল প্রতিযোগিতায় ছয়টি খেলাতেই নেমেছিলেন। তাঁরও আগে জাতীয় দলের প্রতিনিধি ঊনিশবার।

ইংল্যাণ্ডের ম্যানেজার আলফ র‍্যামসীও কোহেনের খেলার ভক্ত। ইংল্যাণ্ডের এই প্রাক্তন (র‍্যামসী) রাইট ব্যাকের চাইতেও কোহেন নির্ভরযোগ্য বলে অনেকের ধারণা।

ফুটবল নিয়ে ইনি অনেক ভাবেন। চিন্তা করেন কোথায় কি ভাবে কোন অবস্থায় অমুক দল বিজয়ী হল। চুল চেরা বিচার করেন প্রতিটি পাসের। কোহেনের সতীর্থরা বলেন, এই ভাবনাই কোহেনকে বড় করেছে। বড় করেছে বর্তমানের রক্ষণ মূলক খেলায় তাঁর আক্রমনাত্মক ভূমিকা। বল নিয়ে তাঁর দ্রুত দৌড়ও দেখার মতন। তাই ফুলহামের সঙ্গে খেলায় হোক, হোক বা কোন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা জর্জ কোহেন অনেকের ওপরে। ইংল্যাণ্ডের সেরা রাইট ব্যাক।

ডি. স্টিফানো

ফুটবল এগারজনের খেলা। ইংল্যাণ্ডের ফুটবল-ম্যানেজার র‍্যামসী বলেছেন—সকলের দায়িত্ব সমান, কেউ কারুর চাইতে কম নন। "একজনে একটি টীম হয় না, হতে পারে না"—ফুটবলে যে আজ মাত্র হাতে-খড়ি দিয়েছে, সেও এই কথা বলবে। কিন্তু আর্জেন্টিনার ছেলে ১৯৫৩-য় আটলান্টিক পার হয়ে যখন রিয়াল ম্যাড্রিদে যোগ দিয়েছিল তখন রীতিমত সোরগোল। এই সেণ্টার ফরোয়ার্ড একাই টীমকে সবার সেরা করে তোলেন। দেখা গেল এগার সিজনে রিয়াল ম্যাড্রিদ আটবার চ্যামপিয়ন। এই টীম সর্বখেলার সেরা হল, হল জগদ্বিখ্যাত। ১৯৫৬ থেকে ১৯৬০-এর মধ্যে এই টীম অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠল। ইউরোপীয়ান কাপেও রেকর্ড করল পাঁচবার বিজয়ী হয়ে।

গর্বের কথা সকল বিজয়ের মূলে একাই ছিলেন—ডি. স্টিফানো। খেলাকে আয়ত্তাধীন রাখা, বল মাঝ মাঠে সীমাবদ্ধ, গোল দেওয়া প্রভৃতি একাই করেছেন এই সেণ্টার ফরোয়ার্ড। যেন ট্রোজান হীরো! রিয়াল ম্যাড্রিদের সব সাফল্যের মূলে যে ইনিই এতে কারুর সন্দেহ নেই।

ডি. স্টিফানো সম্ভবতঃ সর্বকালের সেরা সেণ্টার ফরোয়ার্ড। এখন একচল্লিশ বছরেও অদম্য শক্তির অধিকারী। সজোরে গোলে সট, নিজের পেনাল্টি এরিয়ার কাছে ট্যাকলিং আজও দেখার মতন। বুয়েন্স আয়ারের রাজপথে যিনি দৌড় প্রতিযোগিতায় নামতেন, খেলার মাঠেও বল পড়লে তাই তাঁকে ধরা সাধ্যাতীত চিরকাল। মাঠে তাঁর চলাফেরা অনুশীলনের অতীত, অনুকরণের উর্ধ্বে।

আর্জেন্টিনার পক্ষে সাতটি ম্যাচ খেলার পর অন্যান্যের সঙ্গে বোগোটা চলে এলেন। লক্ষ টাকার বিনিময়ে মিলিওনীয়ারস ক্লাবের ম্যাচে নামলেন।

১৯৬৩-র আগে পর্যন্ত ওখানে ছিলেন। তারপর আবার দল বদল। গেলেন রিয়াল মাদ্রিদে। স্পেনে গিয়ে ঠিক হল একযোগে রিয়াল ম্যাড্রিদ ও সি. এফ বার্সিলোনার হয়ে খেলবেন। অবশ্য আগের কর্মসূচী ছিল ১৯৫৩-৫৪-য় খেলবেন রিয়ালের পক্ষে ও পরের সিজন বার্সিলোনার হয়ে। কিন্তু তা হল না। লীগে নেমেই ডি. স্টিফানো সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মান পেলেন। ম্যাড্রিদ হল লীগ চ্যামপিয়ন। স্পেনে নতুন রেকর্ড স্থাপিত হল। পরের পছর বার্সিলোনায় যেতে দিলেন না রিয়াল ম্যাড্রিদ। ওদের সত্তর হাজার পাউণ্ড দিয়ে বিদায় দিল।

পুশকাসের আসার পূর্ব পর্যন্ত ডি. স্টিফানো ছিলেন ওই টীমের একচ্ছত্র অধিপতি।

১৯৫৮-য় ইওরোপীয়ান কাপের সময় ম্যাড্রিদের এমন অবস্থা ছিল যে, ঐ ফাইন্যালে ইটালীর কাছে এঁরা দাঁড়াতেই পারে নি। স্পেনের খেলোয়াড়রা এমন মনোভাব নিয়ে খেলতে নেমেছিল যে, তারা যেন হারতেই এসেছে। দুগোলে স্পেন এগিয়ে গেল। ডি. স্টিফানো, ডন এ্যালফ্রেড আপ্রাণ চেষ্টা করেও মিলান এ. সি-কে ঠেকাতে পারলেন না। শুধু এক ঘণ্টা তো ম্যাড্রিদের গোলের কাছেই বল ঘোরাফেরা করল।

কিন্তু খেলা শেষের পনের মিনিট আগে অবস্থার পরিবর্তন হল। স্টিফানো একলাই গোল দুটো শোধ করলেন। পাঁচ মিনিট পরে আবার ম্যাড্রিদ এক গোলে পিছিয়ে গেল। সুতরাং হার অবধারিত। ইটালীর গ্রিলোকে নিয়ে তখন কি উল্লাস! খেলা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু স্টিফানো অঘটন ঘটালেন গোল পরিশোধ করে। বুঝিয়ে দিলেন একজনেও খেলা যায়।

আলফ্রেড র‍্যামসী

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস আগামী বিশ্বকাপে (১৯৬৬) ইংল্যাণ্ড বিজয়ী হবে।" এ ১৯৬৩-র পয়লা মে'র কথা। আলফ্রেড র‍্যামসী সরকারী-ভাবে ইংল্যাণ্ড দলের ম্যানেজার নিযুক্ত হওয়ার পর ঐ ভবিষ্যৎ বাণীটি করেছিলেন। র‍্যামসী বলেছিলেন—আমার মতে এদেশে যত খেলোয়াড় জন্মসূত্রে ফুটবল পেয়েছে, এমন আর কোথাও নেই। এখন আমার কাজ হবে এদের সকলকে একত্রিত করে প্রথম শ্রেণীর টীম তৈরী করা"।

তিন বছর আগে র‍্যামসী যে কথা বলেছিলেন গত বছর তা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গিয়েছে। ইংল্যাণ্ড শুধু একটা প্রথম শ্রেণীর টীম নয় ফুটবলের বিশ্ববিজয়ী হয়েছে।

র‍্যামসী ভীষণ আত্মবিশ্বাসী। ইনিই ইংল্যাণ্ডের প্রথম পেশাদার ম্যানেজার। খেলোয়াড় জীবনে নিজেও ছিলেন প্রভূত খ্যাতির অধিকারী। লণ্ডনের যে বিখ্যাত টটেনহাম হসপার এবার এফ. এ কাপ বিজয়ী হল র‍্যামসী ছিলেন তার ফুলব্যাক। তৎকালে ঐ ক্লাবের প্রথম ও দ্বিতীয় ডিভিশন লীগ চ্যামপিয়নের জন্য এর দান অপরিসীম। ইংল্যাণ্ডের হয়ে একালের ম্যানেজার সেকালে ৪২টি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় রাইট ব্যাক ছিলেন, এছাড়া ইংল্যাণ্ডের অধিনায়কও দুবার।

বছরে সাড়ে চার হাজার পাউণ্ডের বিনিময়ে পেশাদারী ফুটবল শুরু করেছিলেন ইপসউইচ টাউনে। "আমার জীবনে তারপরের স্মরণীর ঘটনা বিশ্বকাপ। যখন আমাকে এ দায়িত্ব দেওয়া হল তখনই মনে হয়েছিল ইংল্যাণ্ড বিশ্বকাপ জিতবে।"

অতঃপর নিজের আশা সার্থক করার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। প্রথম কাজঃ টীমে ক্লাব-স্পিরিট আনা। লীগে অংশ গ্রহণকারী ক্লাবগুলোর দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় যখন ইংল্যাণ্ড যোগ দিতে গিয়েছে, প্রত্যেকবার সঙ্গে একজন ডাক্তার পাঠিয়েছেন। র‍্যামসী এই প্রসঙ্গে বলেছেন—ক্লাবগুলো নিশ্চিন্ত হতে পারে, স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়তে পারে এই ভেবে যে, সঙ্গে ডাক্তার রয়েছেন। সুতরাং কেউ অসুস্থ হোক বা মাঠে নেমে আহত হোক চিন্তার কোন কারণ নেই

শুধু ইংল্যাণ্ডের সিনিয়র টীমের ম্যানেজার নন। ২২ জনকে নিয়ে যে টীম গঠিত হয়েছিল তার মূলে আর কেউ নন, এক হাতেই দল নির্বাচন করেছিলেন। এ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তার কাছে চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। দেশের সম্মান তার ওপর নির্ভরশীল। ইংল্যাণ্ড যদি কোন খেলায় হারে তার কৈফিয়ৎ যেমন দিতে হবে, তেমনি জিতলে তিনিই পাবেন প্রশংসা। (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য ব্রাজিল বিশ্বকাপে হেরে যাওয়ায় কোচ ফেওলার জন্য ওদেশের লোক রাজধানী রায়ো-ডি-জেনিরোতে ফাঁসীর কাঠ তৈরী করেছিলেন।)

র‍্যামসী সব জেনে কঠিন দায়িত্ব সহজভাবে আপন স্কন্ধে তুলে নিয়েছিলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে অন্যদের পরামর্শ শুনতেন। এটা করুন, তাকে নিন, অমুক ভাল খেলে, ইংল্যাণ্ডকে বিশ্বের সেরা করতে হলে একে ছাড়া উপায় নেই ইত্যাদি। ধৈর্যের সঙ্গে সব শুনতেন র‍্যামসী। কিন্তু নিজের সিদ্ধান্তের ওপর কারুর প্রভাব টেঁকে নি।

রোজই তিন চারবার ড্রয়ার খুলে ২২ জনের নামের তালিকাটি বের করতেন। 'ইংল্যাণ্ড স্কোয়াড'-কে দেখতেন। ভাবতেন আর কোন নতুন নাম সংযোজন করা যায় কিনা। পরমুহূর্তে আবার অন্য চিন্তা ; এই বিখ্যাত-র চাইতে ঐ নতুন ছেলেটি ভাল খেলছে, ওকেই নেওয়া যাক একে বাদ দিয়ে। হ্যাঁ, র‍্যামসী ছাড়া আর কেউ এই তালিকার কথা জানতেন না।

র‍্যামসী ইংল্যাণ্ডকে জয়ের পথে এগিয়ে নেওয়ার জন্য কতকগুলো পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিলেন, খেলোয়াড় নির্বাচন করেছেন পাকা তিনবছর ধরে। স্ব স্ব ক্লাবের হয়ে কে কত ফাষ্ট খেলতে পারে, ইংল্যাণ্ডের স্কীমে কতটা খাপ খাওয়াতে পারবে। বড় খেলোয়াড় হলেও খারাপ খেললে তাকে বাদ দিতেই হবে—এই হল র‍্যামসীর নীতি। খেলোয়াড়ের সামর্থ দেখতেন, বয়স নয়। র‍্যামসীর ফর্মূলা ৪-৩-৩। "টীমের এগার জনের কেউ কারুর চাইতে কম নন।"

বিশ্বের সেরা ম্যানেজার হিসেবে তিনি ইংল্যাণ্ড ও বিদেশের বড় বড় ক্লাব থেকে বর্তমানের চাইতে আরও বেশি অর্থের বিনিময়ে দল পরিচালনার অনুরোধ পাচ্ছেন। এখন তাই প্রশ্ন—তিনি কি বর্তমান পদেই থাকবেন ? না, অন্য কোথাও যাবেন। অবশ্য র‍্যামসী বলেছেন, "আরও একটি বিশ্বকাপের খেলা সম্মুখে—১৯৭০-এ মেক্সিকোয়। ওটা আরও ভাল হওয়া চাই যে!"

অ্যান্টানিও র‍্যাট্রিন

"আমরা যদি পুরো টীম কিংবা দশজনেও খেলতে পারতাম, তাহলে ইংল্যাণ্ড কিছুতেই জিততে পারত না। কিন্তু মাঠ থেকে আমার বহিষ্কারে দলের সকলের মন ভেঙে যায়। আর্জেন্টিনার সব আশা, সব স্বপ্ন হল ব্যর্থ।"

গত বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার পরাজয়ের পর অধিনায়ক অ্যান্টানিও র‍্যাট্রিনের উক্তি আজও ফুটবল বিশেষজ্ঞ ও বিশ্বকাপের দর্শকদের আলোচনার বস্তু। কেউ বলছেন : রেফারীরা যে কুকীর্তি করেছে

তাতে র‍্যাট্টিন মাঠে থাকলেও জিততে হত না। যেন তেন প্রকারে বিশ্বকাপ ইংল্যাণ্ডকে পাইয়ে দেওয়া হত। ব্রাজিলের ঐ হাল হল, আর আর্জেন্টিনা তো কোন্ ছার!

অন্যদের অন্যমত ঃ বিশ্বকাপ এবার ইংল্যাণ্ডের অনুকূলেই ছিল।

বিস্ময়ের সংবাদ আরও ঃ গত বছর ব্রিটিশ সংবাদিক, সাংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের লেখকদের মতে র‍্যাট্টিনকে বড় খেলোয়াড়দের তালিকায় ফেলাই হয়নি। তবুও ভাল অনেকের নামই বাদ গিয়েছে। পনের জনের এই তালিকায় মাত্র তিনজন ফুটবলার বাকি সব অন্য খেলার। পেলেও বাদ। এই পনের তালিকায় বিশ্বকাপ বিজয়ী ইংল্যাণ্ডের ক্যাপ্টেন ববিমুর তৃতীয়, ইওসেবিও পঞ্চম আর জার্মানীর উয়ে সিলারকে ত্রয়োদশ স্থানে রাখা হয়েছে।

বিস্মিত হয়েছে ব্রিটিশ ওলিম্পিক এ্যাসোসিয়েশনের সরকারী মুখপত্র 'ওয়ার্ল্ড স্পোর্টস'। তাদের মতে অ্যাণ্টানিও র‍্যাট্টিনের প্রতি অবিচার করা হয়েছে, ঘোর অবিচার। র‍্যাট্টিনকে গত জুলাইয়ে বিশ্বকাপের খেলার সময় মাঠ থেকে বের করে দেওয়ার ব্যাপারেও 'ওয়ার্ল্ড স্পোর্টস' বরদাস্ত করতে পারেনি। তাঁর প্রতি শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও অনুচিত হয়েছে বলে অনেকে মন্তব্য করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন—'এ দুঃখজনক ও বিস্ময়কর ব্যাপার'।

গত (১৯৬৬) জুলাইয়ে জুল রীমের খেলায় জার্মানীর রেফারী রুডলফ ক্রীটলীন একে মাঠ থেকে বের করে দেন। র‍্যাট্টিন কোয়ার্টার ফাইন্যালে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে খেলার সময় পান মার্চিং অর্ডার। তারপর 'ফিফা'র কাছ থেকে ফর্মান এল ঃ র‍্যাট্টিন চারটি খেলার জন্য সাসপেণ্ড।

র‍্যাট্টিন কি দোষ করেছিলেন, তা আমার বিচার্য বিষয় নয়! তবে তাঁর সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি ছিল অনেক। রেফারী রুডলফকে র‍্যাট্টিন যা বলতে চেয়েছিলেন রেফারীর তা বোধগম্য হয় নি। র‍্যাট্টিনের ভাষা রুডলফ বোঝেন নি। মাঠের মধ্যে দোভাষী তো ছিলনা, থাকেনা।

র‍্যাট্টিন রেফারীকে খেলোয়াড়দের বদ মেজাজ ও আরও কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রেফারী ভেবেছিলেন যে র‍্যাট্টিন বুঝি তাঁর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। এবং অতঃপর মার্চিং অর্ডার।

র‍্যাট্টিন ৪-১-৫ খেলার ছকে অনন্য। 'দি "ওয়ান" ইন দ্য মিড্‌ল অফ ফোর "ওয়ান"'। ইংল্যাণ্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক জো মার্স্যার ওর মার্চিং অর্ডার পাওয়ার আগে বলেছিলেন : বিশ্বকাপে এবারের সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হচ্ছেন আর্জেন্টিনার সেণ্টার হাফ অ্যাণ্টনিও র‍্যাট্টিন। বলেছেন "আহা আমার দলে যদি এমন খেলোয়াড় থাকত!" তাকে মাঠ থেকে বের করে দেওয়ার পরেও বড় বড় সমালোচকরা জো মার্স্যার র‍্যাট্টিন সম্পর্কে যা বলেছিলেন, তার চাইতেও প্রশংসা করেন।

চার ব্যাক ও পাঁচ ফরোয়ার্ডের মাঝে র‍্যাট্টিন একাই হাফ ব্যাক। খেলা সুরুর পর মাঠ-ময় তার দর্শন মেলে। রক্ষণভাগের সদাজাগ্রতার সঙ্গে স্কোরারের ভূমিকাও র‍্যাট্টিনের নাম উল্লেখযোগ্য। আজ তিনি শুধু আর্জেন্টিনার নয়, গোটা দক্ষিণ আমেরিকায় অদ্বিতীয় খেলোয়াড়। ছয় ফুট, আড়াই ইঞ্চির এই দীর্ঘদেহী ফুটবলারের এখন নাম 'বোকা জুনিয়রস' ক্লাবে। ঐ ক্লাবের সেরা এবং বিশ্বজোড়া নাম হলেও র‍্যাট্টিন আজ পর্যন্ত কোনদিন কোচের আদেশ অমান্য করেন নি। বোকা জুনিয়রস-এ কত ফুটবলার এসেছেন, গিয়েছেন—ইয়ত্তা নেই। কর্মকর্তারা কখনও ইতস্ততঃ করেন নি। র‍্যাট্টিন অবশ্য দল পরিবর্তনের কথা ভাবেন নি, কোনদিন। তবে মাঝে মাঝে খবরের কাগজের পাতায় বা খেলার মাঠের গুঞ্জন উঠলে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। কারণ, এমন খেলোয়াড় নাকি হয় না। "পৃথিবীতে মাত্র একজন র‍্যাট্টিন আছেন"।

এতবড় খেলোয়াড় যে আর্জেন্টিনার কোন রেফারী তাঁকে মাঠ থেকে বের করে দেওয়ার সাহস পান নি। রেফারীরা বলেন, মাঠে নেমে দু একটা ফাউল কেউ কোনদিন করেন নি, এমন খেলোয়াড় বিশ্বে বিরল। র‍্যাট্টিনও এ দোষ মুক্ত নন, কিন্তু এত জনপ্রিয় যে, তাঁর বিরুদ্ধে ফাউল দেওয়া রীতিমত ঝুঁকির ব্যাপার।

লেভ ইয়াসিন

একলক্ষ দর্শক চেঁচিয়ে উঠলেন। "ক্যাসিয়াস ক্লে, ক্যাসিয়াস ক্লে"। ১৯৬৩-র তেইশে অক্টোবর লেভ ইয়াসিন ডান হাতের একটি পাঞ্চে সকলের হৃদয় জয় করলেন। পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর্যন্ত তিনি ছিলেন 'পবিত্র'। একটি বলও ছুঁতে হয় নি। সেদিন লেভ ইয়াসিন শুধু রাশিয়ার জাতীয় দলে সেরা নয়, ১৯৬৩-র 'ইওরোপীয়ান ফুটবলার অফ দ্য ইয়ার' হওয়ার সোপানও তৈরী করেন। 'সাঁইত্রিশ বছরের জীবনে কুড়ি বছর প্রথম শ্রেণীর ফুটবলে রয়েছেন'—এ পঁয়ষট্টির আগস্টের কথা। তার মধ্যে ৫৫বার অধিনায়কত্ব।

গত বিশ্বকাপে অন্যতম দর্শনীয় ছিল লেভ ইয়াসিনের খেলা। এই প্রথম রাশিয়া বিশ্বকাপের সেমি-ফাইন্যালে উঠেছিল এবং এর মূলে ছিলেন এই গোলকীপার। কোয়ার্টার ফাইন্যালে হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে খেলা আজও অবিস্মরণীয়। একটার পর একটা গোল ঠেকিয়েছেন। ৯০ মিনিট সংগ্রাম করেছেন। ঐ খেলায় উপস্থিত ৫০০ ফুটবল বিশেষক খেলা শেষে বলেছিলেন—ইয়াসিন না থাকলে লিভারপুলের গুডিসন এ্যাভিনিউ পার্কে এই খেলার ফল অন্যরকম হত।

ভাগ্যিস ছয় ফুট, তিন ইঞ্চি দৈর্ঘের এই গোলকীপার ছিলেন!

ইয়াসিন এই নিয়ে পরপর তিনবার বিশ্বকাপের খেলোয়াড়। প্রথম নেমেছিলেন ১৯৫৮-য় সুইডেনে, ১৯৬২-তে গেলেন চিলি। পৃথিবীর সেরা গোলরক্ষকদের অন্যতম এই খেলোয়াড় গোলে দাঁড়িয়ে বলের গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করেন। বুঝতে পারেন বিপক্ষদল কিভাবে ব্যূহ রচনা করছে এবং সেইভাবে সতীর্থদের প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দেন।

১৯৬২ অবধি ইয়াসিন 'বিলো দ্য বেস্ট্' ছিলেন। কিন্তু পনের মাস পর হলেন সবার সেরা। এফ. এ-র শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে খেলা

ইংল্যাণ্ড বনাম ফিফা একাদশের। ফিফার পক্ষে ইয়াসিন খেললেন। কিন্তু তা মাত্র 'ফার্স্ট হাফ'। বিশ্রামের পর ওর বদলে এলেন যুগোশ্লাভিয়ার স্খোসকিক। ইংল্যাণ্ড ঐ খেলায় ২-১ গোলে বিজয়ী হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য ঃ ইংল্যাণ্ড দুটি গোলই দেয় বিশ্রামের পর—ইয়াসিনের অনুপস্থিতিতে।

জিমি আর্মফিল্ডের ভাষায় ঃ মাঠে যেন তিনি সব সময়ই খেলেন, আধ ঘণ্টা গোলে বল আসার চিহ্ন নেই তবুও মনে হবে খেলছেন। আমি একটা ছবি দেখছিলাম—কয়েক মিনিট ধরে ক্যামেরা রাখা হয়েছে তার পায়ের ওপর। একবারও বল আসে নি, কিন্তু দেখলাম মুহূর্তের জন্যও ইয়াসিন দাঁড়িয়ে নেই। যেমন ভাবে খেলা হচ্ছিল, বল এদিক ওদিক যাচ্ছিল, ঠিক তার গতি প্রকৃতি অনুসরণে ইয়াসিনও গোলের মুখে চলাফেরা করছিলেন।"

ইয়াসিন কেবল মাত্র অবধারিত গোল বাঁচিয়েই খ্যাত নন, রেকর্ড সংখ্যক পেনাল্টিও ধরেছেন। এবং এ সম্ভব হয়েছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনুশীলনে। ইয়াসিন বলেন "প্র্যাকটিশ হ্যাট মেকস পারফেক্ট"। মাঠের বাইরে—তিনি অসাধারণ পড়ুয়া—সিরিয়স টাইপের সব বই চাই। ছবি তোলেন। রাজনৈতিক কারণে ইয়াসিন সোভিয়েটের নাগরিক বলে পরিচয় দিতে বেশি আগ্রহী হলেও ; ভৌগোলিক দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে বলব—তিনি ইওরোপের। এবং এই জন্য ইওরোপীয় টীম গঠন করা হলেই অদ্বিতীয়ভাবে এই নামটি এসে পড়ে।

খেলোয়াড়রা ইয়াসিনের খেলা দেখতে যান শেখার জন্য। বল সেণ্টার করতেই এর দিকে নজর রাখলে বোঝা যায় গোটা টীমকে তিনিই নিয়ন্ত্রণ করছেন। পেনাল্টি এরিয়ায় এলে তো কথাই নেই। সকল দায়িত্ব যেন তাঁর। হিসেবে একটুও ভুল হয় না। বল ধরেন মাঝে মাঝে। কখনও পা দিয়েই ফেরৎ পাঠান দূরে নিজের দলের প্লেয়ারদের কাছে। বুঝিয়ে দেন লেভ ইয়াসিন 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'।

ব্রাজিল যখন ৪-২-৪ প্রথায় খেলা সুরু করল রাশিয়ার সংবাদপত্র-গুলো বলতে থাকলো—এ আর নতুন কি! তিন ব্যাকের সঙ্গে আরেকটি সংযোজন মাত্র। ইয়াসিন-ই তো গত কয়েক বছর ধরে এই খেলা খেলছে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ১৯৫৬-র ওলিম্পিক (মেলবোর্ণ) থেকে ইয়াসিন রাশিয়াকে বিজয় মাল্য এনে দিচ্ছেন।

জন্ম ঃ ১৯২৯-এ। মস্কোয়। ১৪ বছর বয়সের কিশোর স্কুলের পড়া ছেড়ে চলে আসে বিমান তৈরীর কারখানায়। সাধারণ জ্ঞানের জন্য এদিকে নৈশ বিদ্যালয়েও নাম ছিল। মাছধরার নেশা তখন থেকে। আইস-হকি, বাস্কেটবল, অ্যাথলেটিকস, ডাইভিংও অনুশীলন করতেন। স্পার্টাক দলের প্রাক্তন সেণ্টার স্টারোষ্টিন মন্তব্য করেছেন ঃ বাস্কেটবলেও তাঁর জুড়ি পাওয়া ভার ছিল।

ইয়াসিন বিবাহিত। মাঠে নামার আগে বল ছুঁয়ে তবে নামেন। পছন্দসই রং 'কালো' নয়—'নীল'।

রাশিয়ার সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত। এমেন্ লিখেছেন—"এ্যান অনার্ড মাষ্টার অফ স্পোর্ট।" 'অর্ডার অফ লেনিন' দেওয়া হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে গোলকীপার হওয়ার যে একমাত্র অ্যাকাডেমী রয়েছে তারও নামকরণ এই গোলকীপারের নামানুসারে।

——

ফিওলা ঃ ফুটবলের কারিগর

ব্রাজিল কি এবারও বিশ্বকাপ পাবে? গত জুলাইয়ে (১৯৬৬) জুলে রিমে শুরুর আগে বিশ্বের ফুটবল প্রিয় মানুষের মনে বারংবার এই প্রশ্ন উঠেছিল। উরুগুয়ে বিশ্বকাপ জিতেছিল ১৯৩০ ও ১৯৫০-এ। ইটালী ১৯৩৪ ও ১৯৩৮-এ। ব্রাজিল পর পর দুবার জুলে রিমে কাপ

নিজের ঘরে নিয়ে গিয়েছে। প্রথম ১৯৫৮-য় ও পরে ১৯৬২ তে। ফুটবলে ব্রাজিলের নাম বিশ্বময় ছড়ায়ে। বিশেষতঃ যুগন্ধর পেলে বর্তমান। তাই সকলের স্বাভাবিক ধারণা ছিল ঃ ব্রাজিলই হবে একমাত্র দেশ যারা পরপর তিনবার বিশ্বকাপের অধিকারী হওয়ার গৌরব অর্জন করবে। বিশ্বকাপের জ্যোতিষীরাও এমন ভবিষদ্বাণীই করেছিলেন।

ব্রাজিল সম্পর্কে এই বদ্ধমূল ধারণার মূলে কিন্তু একটি মানুষ। নাম তাঁর ভিসেন্ট ফিওলা। ১৯৫৮ ও ১৯৬২-তে ব্রাজিলের বিশ্বকাপ জয়ের মূলে ছিলেন তিনিই। "ফিওলা এবারও রয়েছেন, সুতরাং জয়ও অবধারিত।" ফিওলার সঙ্গে ফুটবলের শুধু আত্মিক যোগ নয়, ফুটবল প্রিয়দের তিনি প্রিয়তম। একজন ফুটবল ম্যানেজারের যে কী ভূমিকা থাকতে পারে ফিওলাই তার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। ফুটবল বিশেষজ্ঞরা এঁকে 'অদ্বিতীয় ম্যানেজার' আখ্যা দিয়েছেন।

সাওপোলোর ফিজিক্যাল এডুকেশন কলেজ থেকে গ্রাজুয়েট হওয়া থেকে জয় যাত্রা সুরু। ১৯৩৫-এ যোগ দিলেন সিরো লিয়েলস ক্লাবে, পরের বছর স্যাণ্টোস.এর আটলেন্টিকায়। আটলেন্টিকা তখন দ্বিতীয় ডিভিশনে খেলছে।

১৯৩৭-এ গেলেন বর্তমানের সাওপোলো এফ. সি-তে। সাওপোলোর ম্যানেজার অতঃপর শুধু ব্রাজিল নয় ইওরোপেও খ্যাত। আশ্চর্যের কথা দীর্ঘ তিরিশ বছর অতিক্রান্ত কিন্তু ফিওলা আজও রয়ে গেলেন। সাওপোলোর এই ক্লাবে তার জীবন কাহিনী ওদেশে সকলের কাছে গল্প। তিনবার তাঁকে বড় টীম থেকে 'রিজার্ভ' ও 'জুনিয়ার' টীমের ম্যানেজার পদে নামিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু দেখা যায় ফিওলা আপন প্রচেষ্টায় নিজের টীমকে বিজয়ী করেছেন। ফিওলা যে দলের পুরোধারূপে গিয়েছেন—অন্যের পক্ষে জয়ী হওয়া রীতিমত কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

১৯৫৮-য় ব্রাজিল বিশ্বকাপ বিজয়ী হলে আর্জেন্টিনার 'বোকা জুনিয়রস' ক্লাবের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। সারা বছরের জন্য মোটা

টাকার বিনিময়ে তারা ফিওলাকে নিয়ে গেলেন। কিন্তু সাওপোলোয় ত্রাহি ত্রাহি রব। 'ফিওলাকে চাই', 'ফিওলাকে চাই' বলে চারিদিকে পোস্টার। বাধ্য হয়ে ফিওলা ফিরলেন। এবার তিনি সাওপোলো এফ. সি-র জেনারেল ম্যানেজার। ক্লাবের প্রশাসনও তার হাতে। নতুন পদে বসেই কনিষ্ঠদের মধ্য থেকে নিজে বাছাই সুরু করলেন।

তার ফেরার সঙ্গে ক্লাবের সদস্য সংখ্যা আরও বাড়ল, এফ. সি ফিরে পেল নতুন জীবন। সাওপোলো এফ. সি যে কত ফুটবলার তৈরী করেছে তার শেষ নেই। এর মধ্যে কয়েকজন হলেন: ম্যুয়ো (১৯৬২-র বিশ্বকাপের অধিনায়ক) ; ডি. সোডি, ডিনো সানি (১৯৫৮-র বিশ্বকাপ খেলোয়াড়)। বুয়ের ছিলেন ১৯৫০ ও ১৯৫৫-র টীমে। নরোনা ও রুই (১৯৫০ এরটীমে)। বর্তমানের বেলিনিও উল্লেখযোগ্য। এরা সকলেই ফিওলার হাতে-গড়া।

গত বিশ্বকাপের আগে ফিওলা এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, শেষ পর্যায়ে যে আটটি টীম পৌঁছুবে, তাদের যে কেউ বিজয়ী হতে পারে। ইংল্যাণ্ড সম্পর্কে তিনি বলেন, "আমি আশা করি আমরা ফাইন্যালে ওদের মুখোমুখী হবো। আমরা হারলেও অনেক কথা বলার থাকবে। কারণ ইংল্যাণ্ড খেলবে স্বদেশের মাঠে। অবশ্য আমরা অন্যের কাছে হারলে কৈফিয়ৎ দেওয়ার কিছু থাকবেনা"। ইংল্যাণ্ড অবশ্যই এবার জিতবে নিজের মাঠ, নিজেদের দর্শক—ফুটবলে জয়ের পক্ষে এ মস্ত, হাতিয়ার"।

বিশ্বকাপ শেষ হয়েছে। ফিওলার ভবিষদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে। ইংল্যাণ্ড হল বিজয়ী। আর ব্রাজিল অনেক আগেই বিদায় নিল। অবশ্য পরাজয়ের জন্য ফিওলাকে দায়ী করা যায় না। দেশে তার জন্য ফাঁসীকাঠ তৈরী হলেও যারা খেলা দেখেছিলেন—তারা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেছেন—বিশ্বকাপ নিয়ে ইংল্যাণ্ডের মাঠে যে রাজনীতি, হয়েছে তাতে ব্রাজিলের জয়ের কোন আশাই ছিল না।

বেলা গুটম্যান

তিন বছর পর বেলা গুটম্যান লিসবনে ফিরে এলেন। বিমান বন্দরে সেদিন শুধু ফুটবলের দর্শকরা নন, খেলোয়াড় ও বিভিন্ন দলের কর্মকর্তারাও, গিয়েছিলেন অভিনন্দন জানাতে। সকলে ধরে নিয়েছিলেন, হাঙ্গেরীর এই মানুষটি এবার থেকে লিসবনে বসবাস করবেন। এ ভাবার কারণও ছিল যথেষ্ট ;—গুটম্যান লিসবনের বেনফিকা ক্লাবের খেলোয়াড়দের 'গড়ে পিটে মানুষ' করেছেন এবং তারজন্যই ১৯৬১ ও ১৯৬২তে ওরা ইউরোপীয়ান কাপ-বিজয়ী হয়েছিল।

বেলা গুটম্যান আজ শুধু ইওরোপের নন, বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর অন্যতন কোচ। তার কীর্তি বেনফিকাকে উন্নতির সোপানে তোলা। যেই কারুর মধ্যে প্রতিভার ছাপ দেখেছেন, অমনি ধরে নিয়ে গিয়েছেন নিজের ক্লাবে, ট্রেনিং দিয়েছেন বছরের পর বছর। তারপর যখন মনে করেছে—হ্যাঁ, এবার সে উপযুক্ত, অমনি 'ফার্ষ্ট টীম'-এ খেলা সুরু।

'প্রতিভা বাছাই'য়ে গুটম্যান অদ্বিতীয়। সব কিছু দেখে শুনে নিয়ে আসেন বেনফিকায়। বাড়ি কিনতে গেলে যেমন তার মাল মশলা, প্ল্যান, পরিবেশ, অবস্থান ইত্যাদি দেখতে হয়—প্লেয়ার আবিষ্কারও যেন তেমনি। প্লেয়ার বাছাইয়ের পর তিনি, 'ডায়মণ্ড কাটারে'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ষ্টোনগুলো যেমন বিভিন্ন রকমের। কিন্তু ওর থেকে হীরে বের করা 'কাটার'-এর কৃতিত্ব! তেমনি ফুটবলার তৈরীও। কোচিং এমনই।

টীম তৈরীর জন্য গুটম্যান কখনও বড় ও নামজাদা খেলোয়াড়দের ওপর নির্ভরশীল নন। বলেন, "ফুটবল টীম ইজ এ ককটেল"। কোন জিনিষের বাড়াবাড়ি ভাল নয়। স্বাদ ও গন্ধ প্রয়োজনের অতিরিক্ত হলে চলবে না। ঠিক প্রয়োজন মাফিক হওয়া চাই।

এজন্য গুটম্যানের সমালোচকরা অবশ্য এঁকে 'ভাগ্যবান' আখ্যা দিয়েছেন। বলেছেন, যদিও তিনি ভীষণ বাস্তববাদী, কত খেলোয়াড় তৈরী করেছেন, তারও শেষ নেই, তবে এত জয়ের মূলে তার ভাগ্য। ভাগ্যদেবী সর্বদাই সুপ্রসন্না। অবশ্য তিনিও জানেন, কখন কি প্রয়োজন, কাকে দিয়ে কাজ চলবে। ইওসেবিও-র আগমনই বোঝায় তিনি কূটনীতিকও।

কিন্তু শুধুমাত্র ভাগ্যই সর্বত্র কাজ করেনি। তবে ইওসেবিও-র আগমন কিছুটা ভাগ্য বলা যায়। একদিন বিকেলে গুটম্যান লিসবনের এক বুলেভার্ডে ঘুরছেন—যাবার কথা পুরোন বন্ধু সাওপোলো এফ. সি-র সেণ্টার হাফ বুয়ের কাছে। গুটম্যান কয়েকবছর ওখানেও কোচগিরি করে এসেছেন। তারপর আর বুয়ের সঙ্গে দেখা হয় নি। বুয়ের অতঃপর ঐ ক্লাবের কোচ। সেবার আফ্রিকা যাচ্ছিলেন দলবল নিয়ে। গুটম্যান শুনতে গিয়েছিলেন : পর্তুগীজ কলোনীতে ওরা কোন নতুন প্রতিভার দর্শন পেল কিনা। দুজনের দেখা হল এক জুতো সেলাইয়ের দোকানে। কথা হচ্ছিল ঐ বিষয়ে। গুটম্যান শুনলেন—একজন 'কালারড' বয় সম্পর্কে বুয়ের খুব আশান্বিত। ওকে নিজের ক্লাবে নিয়ে যেতেও ইচ্ছুক। সাওপোলো এফ. সি.-কে বলেছেনও। তরুণটির ক্লাব দাবি করেছে—৯৭,৫০০ টাকা। কিন্তু সাওপোলো অসম্মত।

বেলা গুটম্যানের ভীষণ খটকা লাগল। তরুণটি সম্পর্কে অনেক প্রশংসা শুনলেন। সে ইচ্ছে করলে সাওপোলোয় চলে আসতে পারত। কিংবা অন্য কোথাও। কিন্তু তার ক্লাবকে কে টাকা দেবে—সাড়ে সাতানব্বই হাজার? জুতো সেলাইয়ের দোকান ছেড়ে গুটম্যান ক্লাবে টেলিফোন করলেন। বললেন, "আমি মোজাম্বিক যাবো, আর ওখানকার একজন প্লেয়ার সম্ভবতঃ আমাদের টীমে আসতে পারে। দক্ষিণা—সাড়ে সাতানব্বই হাজার টাকা।"

তিনদিন পর দেখা গেল গুটম্যান ফিরে এলেন ইওসেবিওকে নিয়ে।

কোপা

ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড-এর ডেনিস ল, বেনফিকার জোস আগনাস ও জুভেন্টাসের ওমর সিভোরী-র সঙ্গে আর কাকে কাকে একই সারিতে ফেলা যায়? ১৯৬২-তে ইওরোপের ক্রীড়া সাংবাদিকরা একটিমাত্র নাম লিখেছিলেন। তিনি স্টেড রিমসের রেমণ্ড কোপজেউস্কি।

ওজন ৬৭ কিলোগ্রাম, লম্বা পাঁচ ফুট সাড়ে ছ' ইঞ্চি। বেঁটে মোটা এই খেলোয়াড়ের জন্ম সন ১৯৩১। মাস অকটোবর। তারিখ তেরই। জন্মস্থান উত্তর ফ্রান্সের ছোট্ট টাউন নোয়াক্রলেস-মাইন্‌স। আসলে এরা উদ্বাস্তু। কোপার বাবা ছিলেন পোলাণ্ডের এক খনি-মালিক। প্রথম ফার্স্ট ডিভিশনে খেলেন সতের বছর বয়সে। সাম্প্রতিককালে ফ্রান্সে তাঁর খুব হাঁক ডাক না থাকলেও আন্তর্জাতিক ফুটবলে কোপার মত অভিজ্ঞ খেলোয়াড় প্রায় বিরল।

ছয়বার ইওরোপীয়ান কাপে যোগ দিয়েছিলেন। তার মধ্যে কোপার টীম ঐ কাপ জিতেছেন তিনবার। এও রেকর্ড। ১৯৫৬-য় রিমস দলের হয়ে খেলেছিলেন। রিমস রিয়াল ম্যাড্রিদের কাছে ৪-৩ গোলে পরাজিত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী বছরে তাঁকে রিমসের বিরুদ্ধে খেলতে দেখা যায়। রিয়াল সেবার জেতে ২-০ গোলে। ওটা ছিল কোপার ইওরোপীয় কাপের চতুর্থ ফাইন্যাল। তৃতীয় ফাইন্যালটি খেলেছিলেন স্প্যানিশ ক্লাবের হয়ে। ওরা কোপাকে সেবার রিমসের কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ডে কিনে নিয়ে গিয়েছিল। এ ১৯৫৬-র কথা। তিন বছর পর আবার ফিরলেন রিমসে। অতঃপর তাঁর ক্লাব আবার চ্যামপিয়ন হন।

১৯৫৫-য় ফ্রান্স পেনাল্টিতে ইংল্যাণ্ডকে হারালেও শেষোক্ত দলের পক্ষে ওটি কলঙ্কজনক হয়েছিল। কারণ ১৯৩১-এর পর কোন

আন্তর্জাতিক খেলায় ফ্রান্স ওদের (ইংল্যাণ্ড) সঙ্গে জিততে পারেনি। উল্লেখযোগ্য ঐ বিজয়সূচক গোলটি দিয়েছিলেন কোপা। তারপরই কোপা "ইওরোপীয়ান ফুটবলার অফ দ্য ইয়ার" নির্বাচিত হন। এরই তিনমাস পর বেলফাস্টে কোপার নেতৃত্বে অবশিষ্ট ইওরোপীয় দলটি ৪-১ গোলে যুক্তরাজ্যকে পরাজিত করে।

কোপা সেদিন তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে দল পরিচালনা করেছিলেন। যেন কোন সেনাবাহিনীর কম্যাণ্ডার। যুগোশ্লাভিয়ার ইন-সাইড-ফরোয়ার্ড ভসকাস পনের মিনিটে হ্যাট্ ট্রিক করলেন। কোপার পরিচালনায় সেদিন আরও একজন ফরোয়ার্ড আরেকটি গোল দেন। ইচ্ছে করলে কোপা স্কোরার হতে পারেন। কিন্তু তিনি তা না করে সতীর্থদের কাছে বল পাঠিয়ে দেন। ১৯৫৮-য় সুইডেনে বিশ্বকাপেও ফনটাইন তিনটি গোল দেওয়ার যে রেকর্ড করেছিলেন তার মূলে ছিলেন কোপা। কোপা ও ব্রাজিলের ডিডি সেরা খেলোয়াড়ের প্রদক পেলেন।

খ্যাতির শীর্ষে উঠেও কোপা অতীতকে অস্বীকার করেন না। আজও বলেন, "রিয়াল ম্যাদ্রিদে থেকেই আমি আসল ফুটবল শিখেছি।" স্পেনের কাছে আমি এজন্য চিরকৃতজ্ঞ।

কথা উঠেছে কোপা আর সে কোপা নেই। সত্যিই কোপার খেলা আজ অনেকের কাছে কাহিনী। কিন্তু কেন কোপা-র এই হাল ? বছর তিন হল তাঁর তিন বছরের ছেলে মারা গিয়েছে। কোপা আজও এ শোক ভুলতে পারেন নি। আগে মাঠে গিয়ে খেলা দেখে যে আনন্দ পেতেন তিনি তাও বন্ধ। টীমের কারুর সঙ্গে প্রায়শঃ কথাই বলেন না। অনুশীলনও স্থগিত-প্রায়।

সত্যিই দুঃখের কথা যে, যে খেলোয়াড় সকল বাধা অতিক্রম করতেন মাঠে নেমে আজ তার পক্ষে পুত্রশোক ভোলা অচিন্ত্যনীয়।

ক্যারোলি স্যাণ্ডর

কে সবচেয়ে দ্রুতগতির খেলোয়াড়? ঘুরে ফিরে খবরের কাগজগুলোর ঐ এক রা মধ্য ইওরোপে ক্যারোলি স্যাণ্ডরের নাম সকলের মুখে মুখে। ইওরোপের কোথাও এঁর সম্পর্কে সমালোচনা শোনা একেবারেই অসম্ভব। বরং কোন কারণে যদি না খেলেন এবং তা যদি শারীরিক অসুস্থতা হয়, তাহলেও বিক্ষোভের ঝড় বয়ে যাবে। নিজের ক্লাব 'রেড ব্যানার' ছাড়াও হাঙ্গেরীর জাতীয় দল তাঁকে বাদ দিয়ে গঠিত হয় না।

মাঠে নামলেও বিপদ। বিপক্ষদলের চিন্তার অন্ত থাকে না। দুজনকে তো ওঁর পেছনে রাখতে হয় গার্ড দেওয়ার জন্যই!

গ্যারিঞ্চা হাঙ্গেরীর এই খেলোয়াড়ের বল রিসিভ দেখতে ভালবাসেন। স্পেনের গেণ্টো বলেছেন: বল নিয়ে ওর দৌড়বার সময় ধারে কাছে না থাকাই ভাল।

স্যাণ্ডরের সবসময়ের ইচ্ছা মাঠে সব সময় যেন তার দলের কেউ না কেউ তার কাছেই থাকে। "বিপক্ষদলের কেউ বীট করতে পারে, কিংবা বল ছুঁয়েই তিনি দৌড়তে পারেন"।

কুড়ি বছর যখন বয়স স্যাণ্ডর তখন হোম টাউন সেজ-এর জুনিয়র ক্লাবে খেলতেন। রেড ব্যানার-এর কোচ মার্টিন বোকভি একদিন হঠাৎ স্যাণ্ডরের খেলা দেখলেন। খুব ভাল লেগে গেল। বললেন, তোমায় বুদাপেস্ট যেতে হবে। বুদাপেস্টে ক্যারোলিকে নতুন করে ফুটবল শেখান হল। বোকভি দেখলেন ক্যারোলি সব বিষয়েই চোস্ত। তবে কি ভাবে স্পীডকে কাজে লাগান যায় তৎসম্পর্কে এই তরুণ একটু অনভিজ্ঞ। বোকভি তাই উঠে পড়ে লাগলেন।

কিন্তু টেকনিকে স্যাণ্ডরের অগ্রগমন এত আস্তে আস্তে হল যে, ম্যাথু-ফিননে-জুলিলো হতে পারে নি। অবশ্য এখন আটত্রিশে পড়েও

তিনি সকলগুণের অধিকারী, একই খেলার মধ্যে এমনভাবে চলাফেরা করেন যে, বিরুদ্ধপক্ষ হিমসিম খেয়ে যায়। বুঝতেই পারে না তারা স্যাণ্ডরের খেলার গতি কোন পথে কিভাবে চলবে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার 'টনার্ণিং পয়েণ্ট' ১৯৫৪-য়। গ্ল্যাসগোর হ্যাম্পডেন পার্কে স্কটল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে সেবার স্যাণ্ডরের খেলা ও স্কোর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

১৯৫৬-য় হাঙ্গেরীর বিপ্লবের পরও স্যাণ্ডরকে দেশে ফিরতে নিষেধ করা হল। বলা হল অবস্থা আরও শান্ত হলে ফিরে আসবে। ইংল্যাণ্ড থেকে তাঁকে নানারকম লোভনীয় 'বন্দোবস্তের' কথা বলা হল। কিন্তু স্ত্রী, পুত্রের টানে স্যাণ্ডর ঘরে ফিরলেন।

১৯৫৮-য় বিশ্বকাপের আগে হাঙ্গেরীর ভরসা ছিলেন এই খেলোয়াড়। সিনিয়রদের গঠিত টীম হলেও ম্যাগিয়ারস ভাল খেলতে পারেন নি। অথচ এর আগে সুইডেনে এরা দারুণ খেলেছিলেন। বিশ্বকাপে ঐ বছর হাঙ্গেরীর ফুটবল প্রিয়দের স্যাণ্ডরের দিকে তাকিয়ে থাকতে হল। বিপক্ষ দলগুলোর দৃষ্টিও ঐ একমাত্রের প্রতি। স্যাণ্ডর সেবার মুখ রক্ষা করেছিলেন।

স্যাণ্ডরের ইনসাইড পার্টনার ন্যাণ্ডর হাইজকুটি বলেন ঃ ইনি হলেন "স্প্লেনডিড সকার মেশিন"। একে রুখতে গেলে সামনে, পেছনে চারিদিকে গার্ড দিতে হবে। কিন্তু আজ পর্যন্তও স্যাণ্ডরের কাছাকাছি গিয়ে কেউ ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেনি। যখন কেউ পৌঁছেছে, দেখা গিয়েছে বল তার আগেই অন্যপায়ে। স্যাণ্ডর দ্রুত পাস করে দিয়েছেন।

ইন এ্যাপিয়ারেন্স স্যাণ্ডর ইজ ডিসটিঙ্কটিভ রাদার দ্যান ডিসটিনগুইসড। খুব কম সময়েই তিনি জার্সি পরে মাঠে নামেন। মাঠে নামলে তাই স্যাণ্ডরকে বুঝতে দেরী হয় না। তিনি সকলের চাইতে পৃথক। সিন-গার্ডও পরেন না। অবশ্য এটা বিপজ্জনক হলেও আজও কোন বিপদ ঘটেনি। কারণ, দৌড়ে তার কাছাকাছি আসা কষ্টকর।

জোসেফ ম্যাসোপাষ্ট

জোসেফ মাসোপাস্ট। ইওরোপের অন্যতম 'বেস্ট উইং-হাফ' চেকোশ্লোভাকিয়া এবং ডুকলা প্রাগের এই খেলোয়াড়। ইওরোপের বাইরেও আজ তাঁর খ্যাতি। বলের খোঁজে মাঠময় ঘুরে বেড়ান। কিন্তু তাই বলে পুরাকালের খেলোয়াড়দের মত যত্রতত্র আক্রমণ তার উদ্দেশ্য নয়। শারীরিক দিক দিয়ে প্লুশকালের মত না হয়েও তারই সমান শক্তিধর।

ম্যাসোপাস্ট যখন বল নিয়ে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যান বিপক্ষদলের কেউ তার কাছেই আসতে পারে না, সতীর্থরাও তাই যখন বুঝতে পারেন বল ম্যাসোপাস্টের পায়ে পড়তে যাচ্ছে—সঙ্গে সঙ্গেই নিজের পজিশানে চলে যান। তাই বলে ম্যাসোপাস্ট-এর কোষ্ঠীতে সব সময় গোল দেওয়ার ভবিষদ্বাণী নেই। যখন দেখেন কেউ স্কোর করছে না বা করতে পারছেন না, ম্যাসোপাস্ট তখনই গোলে বল মারেন।

১৯৫৮-র কথা বলি। ওই বছর চেক জাতীয় টীমের বড় দুঃসময় ছিল। ঐ বছর শীতে সাতটা খেলায় তাঁর দল কোনক্রমে সাতটি গোল দিতে পেরেছিল। রাশিয়ার সঙ্গে হারল ২—১ গোলে, ১—০ গোলে বুলগেরিয়া, এবং তুরস্কের সঙ্গে পরাজয় ১—০ গোলে। অবশ্য ইটালীর সঙ্গে উভয়পক্ষে একটি করে গোল দিয়েছিল। শোধ করা গোলটী ম্যাসোপাস্টেরই দেওয়া। রাশিয়ার বিরুদ্ধেও ইনি ছিলেন একমেবাদ্বিতীয়ম্।

ম্যাসোপাষ্ট শুধু উইং-হাফে নন, ইনসাইড ফরোয়ার্ডেও দারুণ খেলেন। কিন্তু প্রথমটির জন্যই চেকোশ্লোভাকিয়া গর্বিত। ডুকলার ক্যাপ্টেন নোভাক এই কীর্তিমানের সঙ্গে কয়েকশ' ম্যাচ খেলেছেন। নোভাক তাই ম্যাসোপাষ্টের গতিবিধি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। ম্যাসোপাষ্ট বল পেলে নোভাককে তাই সব সময়েই কুড়ি গজ দূরে

দৌড়তে দেখা যায়। তিনি বলেন, ম্যাসোপাস্টের পাস-এর দূরত্ব ঐ। একটুও কমবেশি হয় না। একেবারে মাপা সট।

বয়স সাঁইত্রিশ। জন্ম উত্তর বোহেমিয়ার এক ছোট শিল্পনগরীতে। ডুকলা প্রাগের সঙ্গে রয়েছেন ১৯৫২ থেকে। ডুকলা স্টেডিয়াম থেকে ম্যাসোপাস্টের বাসগৃহের দূরত্ব ৩০০০ গজও নয়। স্ত্রী এবং দুই সন্তান নিয়ে তাঁর সংসার। ডুকলার অন্যান্য খেলোয়াড়দের মত তিনিও সেনাবাহিনীতে কাজ করেন। চিলিতে ১৯৬২-র বিশ্বকাপে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের জন্য তাঁকে 'মেজর'-এ প্রমোশন দেওয়া হয়েছে। ক্রীড়া সাংবাদিক ও লেখকদের ভোটে তিনি ঐ বছর 'ইওরোপীয়ান ফুটবলার অফ দ্য ইয়ার' নির্বাচিত হন।

ডুকলা ও চেক জাতীয় দলের সঙ্গে ম্যাসোপাস্ট পৃথিবীর প্রায় সব ফুটবল দেশ পরিভ্রমণ করেছেন। ইওরোপীয় কাপ, বিশ্বকাপ ছাড়াও অন্যান্য প্রতিযোগিতায় তিনি ছিলেন অবশ্য খেলোয়াড়। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় নেমেছেন পঞ্চাশ বারেরও বেশি।

একবার একজন সাংবাদিক ম্যাসোপাস্টকে জিজ্ঞেস করেছিলেন: আপনি কতদিন ফুটবল খেলবেন? ম্যাসোপাস্ট হেসে উত্তর দিয়েছিলেন: অনেকেই বলেন তিরিশ বছরই যথেষ্ট। কিন্তু আজকাল তিরিশের ওপরও অনেকে স্বাভাবিকভাবেই খেলছেন। অবশ্য আমার সম্পর্কে অনেকেই পাঁচবছর আগে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। বলেছিলেন: এবার ছাড়ো। কিন্তু আমি এখনও এখানে রয়েছি।

'গোল'। ফুটবলে এই শব্দটি শুনলে এই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন খেলোয়াড়ের মনেও দোলা দিয়ে যায়। খেলার রেশ মিটে গেলেও গোলকে ভোলা যায় না। ম্যাসোপাস্ট যেসকল অজেয় খেলোয়াড়দের মুখোমুখী হয়েছেন তাঁরমতে তাঁরা হলেন ব্রাজিলের পেলে, ইংল্যাণ্ডের এডওয়ার্ডস, হাঙ্গেরীর পুশকাস, কোয়েসিস্ ও হাইজকুইত। স্ট্যানলী ম্যাথিউজ এবং ডি. স্টিফানোর ওপরও তার অগাধ শ্রদ্ধা। "কিন্তু এদের বিরুদ্ধে কখনও আমার খেলার সুযোগ হয় নি।"

প্লুসকাল

আঠাশ থেকে তিরিশের মধ্যেই সাধারণতঃ বড় খেলোয়াড়রা উন্নতির শীর্ষে ওঠেন। অধিকাংশের ক্ষেত্রেই এর প্রমাণ দেখা গিয়েছে। সাতোপলাক প্লুসকালের ক্ষেত্রে তো এ ধ্রুব সত্য। প্লুসকাল পঁয়ত্রিশেও উন্নতির শীর্ষে। এই বয়সেও তার ফুটবলের জৌলুস এতটুকু হ্রাস পায়নি! কিন্তু প্লুসকাল বলেন, 'আমার সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায় ছিল চেকোশ্লোভাকিয়া যখন ৪-২-৪ প্রথায় খেলা সুরু করে'। রক্ষণমূলক খেলায় স্মরণকালের মধ্যে এমন 'উইং-হাফ' দেখা যায়নি।

ব্রাজিলের লেফট-হাফ অরল্যাণ্ডোর খেলা যারা দেখেছেন, তারাও বলবেন তিনি প্লুশকাল পদ্ধতির প্রতিষ্ঠাতা হলেও দ্বিতীয় জনই অদ্বিতীয়। ফুটবল প্রিয়রা ম্যাসোপাষ্টকে তারিফ করলেও প্লুশকাল সর্বসম্মতভাবে এখনও 'বিগ ফেলো'।

জন্ম ১৯৩০-এর ২৮শে অক্টোবর। উত্তর মোরাভিয়ায়। শহরের বর্তমান নাম গটওয়ালডোভ। বাড়িতে থাকলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভাইয়ের সঙ্গে অতিবাহিত করেন।

ছোটবেলা থেকেই ফুটবল সুরু করলেও বাইরের ম্যাচে অংশগ্রহণ পনের বছর বয়সে। কিন্তু তখন থেকেই সতীর্থদের মধ্যে 'বড়'। যেমন স্বাস্থ্য, তেমনি লম্বায়ও। এখন ছয় ফুট দুই ইঞ্চি। ছোটবেলায় সকলে বলত 'গোল গেটার'।

১৯৫২-য় সর্বপ্রথম বড় ম্যাচে যোগদান। আন্তর্জাতিক খেলেছেন মোট ৫৯ বার। ১৯৫৪-র বিশ্বকাপে অভিজ্ঞতা কম ছিল তাই প্রথম রাউণ্ডেই পর্যুদস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু আটান্নয় আয়ারল্যাণ্ডের সঙ্গে ২-১ গোলে না হারলে কোয়ার্টার ফাইন্যালে উঠতই। অবশ্য পরের বিশ্বকাপে (১৯৬২) চিলিতে চেকোশ্লোভাকিয়ার কথা উল্লেখযোগ্য। ওখানে প্লুশকালের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপুর্ণ, তিন সপ্তাহের মধ্যে পেলে,

স্থয়েরেজ, গালি, রেইস, প্রভৃতির মত আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী হয়ে পড়লেন। চিলিতে রক্ষণভাগে ছিলেন প্লুশকাল আর আক্রমণ-ভাগে ম্যাসোপাস্ট। বিপক্ষ দলগুলিকে এই দুজনই থরহরি অবস্থার স্থষ্টি করেছিলেন। তবু চেহারায় নয়, ফুটবল মাঠেও যে বুদ্ধির প্রয়োজন হয় এবং প্রয়োজনে তিনি তার প্রয়োগ করতে পারেন এই খেলোয়াড় সেবার তার প্রমাণ দিয়েছিলেন। সারাজীবনে একবার মাত্র রেফায়ীর কাছ থেকে সতর্কবাণী শুনেছেন।

একবার খেলার মাঠে দুইদলের দুইজন খেলোয়াড়ে ভীষণ গোলমাল বাধালো। তারই এক সতীর্থকে মেরেছিল বিরোধীদলের একজন। চেক খেলোয়াড় প্রতিশোধ নেওয়ার আগে প্লুশকাল এগিয়ে গেলেন। থামতে বললেন। কিন্তু সতীর্থ শুনল না তার কথা। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সে এগিয়ে গেল। প্লুশকাল এবার কাউকে ক্ষমা করলেন না। দুজনকে দুহাতে ধরে মাঠের বাইরে রেখে এলেন।

গত (১৯৬৬) বিশ্বকাপে একে দেখা যায়নি। বিভিন্ন খেলায় তাই যখন মারপিটের খেলা হয় সকলে প্লুশকালকে স্মরণ করেছেন। বলছেন "প্লুশকাল থাকলে সব গোলমাল মিটিয়ে দিতেন।" প্লুশকাল অবসর নিয়েছেন। কিন্তু আরেকজন প্লুশকাল তৈরীর জন্য তিনি ব্যস্ত। ডাকুলার ইয়ুথ স্কোয়াডে দশ বছর বয়সের স্ভাভতোপ্লাক নামে যে কিশোরটি রয়েছে সে প্লুশকালের ঔরসজাত।

শ্যাফিনো

গত বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে কোন ফুটবল ঐতিহাসিক যদি পৃথিবীর সেরা খেলোয়াড়দের একটি তালিকা প্রস্তুত করেন, তাহলে একটি নাম বাদ পড়ে যাওয়ার ষোল আনা সম্ভাবনা রয়েছে। অথচ তাঁকে কিন্তু বাদ দেওয়া যায় না।

সেরা খেলোয়াড়দের তালিকা থেকে বাদ পড়ার সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়টির পুরো নাম জুয়াঁ আলবার্তো শ্যাফিনো। বাদ পড়ে যাওয়ার কারণ ?

শ্যাফিনোকে তাঁর দেশের মাটিতে পাওয়া যায় না। জাতীয় দলের তালিকায় নাম উঠলেও অনুপস্থিত থাকেন। খেলোয়াড় জীবনের স্মরণীয় অধ্যায় কেটেছে পেনারোল ও এ. সি. মিলানে। পরে আসেন এ. এস. রোমা-য়। কিন্তু যে দলেই খেলুন না কেন—শ্যাফিনো সর্বত্র গ্রেটেষ্ট। যেখানেই খেলুন মনে হবে সাবলীলভাবে খেলছেন। স্থান-কাল ভেদেও শ্যাফিনোর মধ্যে কোন পরিবর্তন নেই!

১৯৫০-এ বিশ্বকাপ ফাইনালের কথা বলি। বিরতির আগে গোলশূন্য ড্র। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে ৪৭ মিনিটের সময় ব্রাজিল এক গোলে এগিয়ে গেল। উরুগুয়ে হারছে। খেলার গতি ফিরেছে। দর্শকরা মুহূর্মুহূ উল্লাস করছে। কিন্তু উরুগুয়ে হঠাৎ মরীয়া হয়ে উঠল। তারা প্রতিঘাত শুরু করলো। এর মধ্যে মারাত্মক হলেন চব্বিশ বছর বয়স্ক ইনসাইড লেফট শ্যাফিনো। দক্ষিণ আমেরিকার অজানা, অখ্যাত এই খেলোয়াড় মাঠের 'হিরো' হয়ে উঠলেন!

বল যদি নিজেদের হাফে থাকে, শ্যাফিনো এক সটে সোজা বিপক্ষ দলের গোলে পাঠাতে পারেন। বিশ্বকাপের ফাইন্যালেও পায়ের এ জোর দেখালেন! সেদিন মাঠময় তবু শ্যাফিনোকে দেখা গিয়েছিল। ব্রাজিলের পেনাল্টি এরিয়ার মধ্যেও তিনি জীবনপণ সংগ্রাম করেছিলেন। কাছে আরেকজন ছিলেন। তিনি ঘিগিয়া। স্কোরার হিসেবে শ্যাফিনোর নাম দেখা না গেলেও ঐ গোলের সকল কৃতিত্ব ছিল তাঁর।

পৃথিবীর সর্বকালের সেরা খেলোয়াড়দের তালিকায় তার নাম দেখা গেলেও নিজের দলের জয়ে তাকে কেমন যেন উদাসীন দেখা যায়। তার টীম জিতছে—হয়তো কোনরকম বেগ না পেয়ে। কিন্তু শ্যাফিনো মাঠের মাঝে প্রায় চুপ হয়েই দাড়িয়ে থাকেন। বন্ধুদের

বলেন, আমি না খেলতেই সহজে জিতে যাচ্ছে যখন, তবে আর মিছে কষ্ট কেন? মাঠের মাঝেই সতীর্থদের ডেকে পরামর্শ দেওয়া সুরু করেন। 'যেন কোন ট্রাফিক পুলিশ যান নিয়ন্ত্রণ করছে—এমনি ভাব'। বোঝাতে থাকেন--কিভাবে পাস দেবে, কখন কি করবে ইত্যাদি।

বড় খেলা হলে শ্যাফিনোর আসল রূপ দেখা যায়। বিশেষতঃ কখনও যদি তার টীম হারতে থাকে। শ্যাফিনো তখন অগ্নিমূর্তি হন। ১৯৫৪-য় সুইজারল্যাণ্ডে বিশ্বকাপের সেমিফাইন্যালের সুরুতে হাঙ্গেরী এগিয়েছিল। বিপাক বুঝে শ্যাফিনো আবার বিপদতারণ করতে আরম্ভ করলেন। শ্যাফিনো ওয়াজ এভরিহোয়ার; এনকারেজিং, কম্যাণ্ডিং, ডিমাণ্ডিং দ্য বল, ডেসপাচিং ইট, লুকিং ফর দ্য রিটার্ণ পাস। এমনভাবে খেলা আরম্ভ করলেন যাতে হাঙ্গেরীয়ানরা উরুগুয়ের ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে না আসতে পারে। খেলা শেষের পনের মিনিট আগের ঘটনা: মাঠের মাঝামাঝি জায়গায় বল পেলেন শ্যাফিনো। দুজনকে কাটিয়ে এগিয়ে গেলেন তিনি। হাঙ্গেরীর প্লেয়াররা এবার নিজেদের গোলের দিকে তাকিয়ে ছুটতে লাগলেন। শ্যাফিনো লং পাশ দিলেন সেণ্টার ফরোয়ার্ড হোবার্গের কাছে। গোল—গো-ল। নতুন উদ্যমে আবার খেলা। মাত্র দুমিনিট বাকি। শ্যাফিনোর পায়ে আবার বল। বল মারলেন হাঙ্গেরীর গোলে। ফিরে এল আবার তাঁরই পায়। শ্যাফিনো নিজে গোল করার চেষ্টা না করে বন্ধু হোবার্গকে আবার পাশ দিলেন। আবার গোল। তবে অতিরিক্ত সময়ে হাঙ্গেরীই দুটো গোল দিয়েছিল। ঐ খেলার পর শ্যাফিনোর দল পরিবর্তন করে এ. সি. মিলান ওকে নিজেদের টীমে নিয়ে এলেন। ফি দিতে হল ১৫ লক্ষ ১২ হাজার টাকা। তৎকালে ঐ ছিল দল পরিবর্তনের রেকর্ড ফী।

শ্যাফিনো স্কোরার নন। কিন্তু ম্যাথিউজের মত 'পাসিং ও 'সুটিং' দৃষ্টিহরণকারী। খেলার মাঠে এমন শান্ত খেলোয়াড় মেলেই না।

ফ্যাচেতি

ফুটবল মাঠে সাধারণতঃ ফরোয়ার্ডদের খেলাই আমাদের চোখে পড়ে। অধিকাংশের মুখে তাদের কথাই শোনা যায়। আর এদের যারা গোল দেন তারা তো মাঠের 'হিরো'। রক্ষণ ভাগে বছরেব পর বছর খেলেও ফরোয়ার্ডের মত একদিনে নাম করা যায় না। অধিকাংশের ধারণা তাই। অবশ্য এ ধারণা পুরো সত্য না হলেও আংশিক সত্য। কিন্তু রক্ষণভাগের খেলোয়াড়রাও অনেকসময় অঘটন ঘটিয়ে থাকেন, ঘটাতে পারেন, ফ্যাচেতি ফুল-ব্যাক হয়েও গোল দেন। এবং এজন্য আজ তিনি শুধু স্বদেশ—ইটালী বা ইওরোপে নয়; বিশ্বের সেরা ফুটবলারদের অন্যতম। ইণ্টারন্যাজিওনেল মিলান, ইওরোপীয়ান চ্যামপিয়নশীপসের সেমি-ফাইন্যাল, ফাইন্যাল কিংবা ট্রান্স কন্টিনেণ্টাল কাপ ম্যাচ যারা দেখেছেন—তারা তো বটেই এমন কি ফুঠবলের যাঁরা চুলচেরা বিচার করেন, এমন বিদগ্ধ সমালোচকরাও ফ্যাচেতি-র প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

ইংল্যাণ্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক জিমি আর্মফিল্ড বলছেন, ১৯৬৪-তে যে ফ্যাচেতিকে একেবারে আমল দেওয়াই হয়নি, পরবর্তী বছর—১৯৬৫-তে তিনি 'ইওরোপীয়ান ফুটবলার অফ দ্য ইয়ার' নির্বাচনে দ্বিতীয় হলেন। ফ্যাচেতির খেলাই প্রমাণ করিয়ে দিল যে বড় খেলোয়াড় হতে গেলে ব্যাক, ফরোয়ার্ডে কোন ফারাক থাকে না। সুযোগ পেলে তারাও প্রমাণ দিতে পারে ফুটবল এগারজনের খেলা।

জন্ম ১৯৪২-এর ১৮ই জুলাই। ইটালীর ট্রেভিগলিওয়। ফুটবল সুরু স্থানীয় ক্লাবে। কয়েকবছর খেললেন ইণ্টার মিলানে। ওখানে গিয়ে ইণ্টার মিলানের হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধারের কাজে লেগে গেলেন। দশবছর পর ঐ ক্লাবের ফুটবলে সঞ্জীবনী মন্ত্র দিলেন। ইণ্টার মিলান আবার ইটালীর চ্যামপিয়ন হল। সুনাম অর্জন ইওরোপীয়ান চ্যামপিয়ন

কাপেও। গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক খেলাগুলোয়ও এই দীর্ঘদেহী অ্যাথলীট গোলদাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। অবশ্য অনেক গোল তিনি দেন নি। কিন্তু যে একটি মাত্র দিয়েছিলেন—তাই-ই জয়সূচক, গোলটি দেন লিভারপুলের বিরুদ্ধে। এটি ১৯৬৫-র সেমি ফাইন্যাল। স্কটল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে তাঁর কর্ণার কিকটি আজও স্মরণীয়। কাউকে বল হেড দিয়ে বা অন্যভাবে ছুঁয়ে দিতে হয় নি। এমনভাবে কিকটি করেছিলেন যে, সোজা গোলে ঢুকে গেল। গোলকীপার অ্যাডাম ব্লাকল ধরতে পারলেন না। ইটালী স্কটল্যাণ্ডকে হারিয়ে গ্রুপ চ্যামপিয়ন হল। অধিকার অর্জন করল বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্যায়ে খেলার।

সুতরাং ফ্যাচেতি ফরোয়ার্ড-এর খেলোয়াড় না হয়েও প্রভূত যশের অধিকারী। ইওরোপীয়ান ফুটবলার অফ দ্য ইয়ার নির্বাচনে এই ব্যাকের নাম সকলের ওপরে থাকলে তাই হবে স্বাভাবিক।

এ পর্যন্ত যাঁরা ঐ গৌরবের অধিকারী হয়েছেন তাঁরা হলেন স্ট্যানলী ম্যাথিউজ (১৯৫৬), ডি. স্টিফানো (১৯৫৭), কোপা (১৯৫৮) ডি. স্টিফানো (১৯৫৯), সুয়ারেজ (১৯৬০), সিভোরী (১৯৬১), ইয়াসিন (১৯৬১), ম্যাসোপাস্ট (১৯৬২), ডেনিসল (১৯৬৪), ইওসেবিও (১৯৬৫)। এর মধ্যে ম্যাসোপাস্ট ও ইয়াসিন 'নন-ফরোয়ার্ড'। ম্যাসোপাস্ট উইংহাফ। আর ইয়াসিন গোলকীপার।

———

ম্যানেজার ম্যাট বাসবি

"ফুটবল ক্লাব ম্যানেজারস মে কাম এ্যাণ্ড ম্যানেজারস মে গো, বাট ম্যাট বাসবি গোজ অন ফর এভার"।

'ব্রুক'-এর মতন ম্যাট বাসবি সম্পর্কে ঐ কথাগুলিও বহু প্রচলিত। যুদ্ধের পর শত শত ক্লাব-নেতার পরিবর্তন হয়েছেন। কিন্তু এই 'স্টার মেকার' চিরস্থায়ী।

১৯৬৫-র অক্টোবরে ওল্ড ট্রাফোরডে তার এই কাজের কুড়ির বছর পূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এমন ম্যানেজার আজও অদ্বিতীয়। ১৯৪৫ থেকে ১৯৬৫ কুড়ি বছরের ম্যানেজার-জীবনে ম্যাট-এর টীম কতবার টপ স্কোরার, ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড-এর লীগ চ্যামপিয়নশীপস, ওয়েমব্লিতে দুবার এফ. এ কাপ বিজয় আজও স্মরণীয়।

ম্যাটের টীম এমন সব রেকর্ড করেছে যে, তখন ফুটবল প্রিয়রা তাকে নিয়ে শত শত কাহিনী শোনায়।

ম্যাটকে বলা হয় 'চির তরুণ'। তরুণ খেলোয়াড় খোঁজার জন্য তিনি হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস 'ফুটবল উন্নতির জন্য তরুণ প্রতিভা অবশ্যই চাই'। চারটি সেরা টীম তৈরী করেছিলেন। সবচেয়ে বড় গুণ ছিল ; খুব খারাপ খেলোয়াড়টিও তাঁর হাতে পড়লে সবার সেরা হতে পারতো। এবং এ কারণে তার হাতে-গড়া কোন টীম জিতলে দর্শকরা খেলোয়াড়দের চাইতে বেশি প্রশংসা করতেন ম্যানেজারকে।

কেউ কেউ বলেন, খেলা নিয়ে সেন্টিমেণ্টাল হওয়া উচিত নয়। কিন্তু ম্যাটের বেলায় একথা খাটে না। তিনি ফুটবলের রূপকথা। ১৯৬২-তে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড এর সসেমিরা। প্রথম ডিভিশন থেকে নেমে যায় যায় অবস্থা। কিন্তু ম্যাট বাসবি নিজের পরিচালন ক্ষমতা বলে ইউনাইটেড-এর মান রক্ষা করেছিলেন।

ম্যাট তিনটি সেরা টীম তৈরী করেছিলেন। প্রথম দলটি জনি কেরীর নেতৃত্বে ১৯৪৮-এ এফ. এ কাপ পেল। দ্বিতীয় দলটি রজার বার্ণের নেতৃত্বে দুবার চ্যামপিয়ন।

ইউনাইটেড-এর জীবনে চরম বিপর্যয় এল। মিউনিখে বিমান দুর্ঘটনায় ১২ জন হতাহত হয়েছিল। বাসবি নিজেও একমাসের ওপর হাসপাতালে ছিলেন। সুস্থ হলে কারুর সাহস হয়নি তাকে টীমের খবর জানাবার।

বাসবি আবার গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। টীম আবার ইওরোপীয়ান কাপের ফাইন্যালে উঠলো কিন্তু পরাজিত হল বোল্টন ওয়াণ্ডারার্সের কাছে। ইউনাইটেড হারলেও দর্শকরা মর্মাহত হননি। সকলের করুণা বর্ষিত হয়েছিল ওদের ওপর।

ম্যাটের প্রচেষ্টায় ইউনাইটেড আবার তৈরী হল। ১ লক্ষ ১৫ হাজার পাউণ্ড দল পরিবর্তনের ফি দিয়ে ডেনিস ল-কে কিনতে কসুর করলেন না। ইউনাইটেড এতে বাধা দেয়নি। কারণ তারা জানতেন ইউনাইটেড-এর পতন অভ্যুদয়ের সঙ্গে ম্যাট বাসবিও সংশ্লিষ্ট। তাছাড়া তার সময়ে ক্লাবের লাভের তহবিলে পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড জমা পড়েছিল।

বাসবি কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ক্লাবের বোর্ডকে জানাতেন, আলোচনা করতেন। অতঃপর সম্মতি পেলে নিজের পরিকল্পনা রূপায়িত করতেন। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড তার কাজের জন্য ক্লাবের অংশীদারও করে নেন। এবং এ বিষয়ে ক্লাবে তাঁর স্থান ছিল তৃতীয়। ম্যানেজার হিসেবে ম্যাট বাসবি এ বিষয়েও অদ্বিতীয়।

এতৎসত্ত্বেও ম্যাট বাসবির চলার পথ খুব সহজ নয়। সামান্য টাকা মা'ইনেয় খনিতে কাজ করতেন। খেলতেন উইং হাফে। বাসবি যখন ফুটবলে যোগ দিলেন খেলোয়াড়দের তখন শোচনীয় অবস্থা ছিল। সামান্য টাকা দেওয়া হত। কিন্তু এসব বাসবিকে পরাহত করতে পারেনি। ফুটবলে উন্নতির জন্য সামান্য সাহায্য পাওয়ার আশায় দুয়ারে দুয়ারে ঘুরেছেন।

তৎকালে সকলে আত্মরক্ষামূলক খেলায় বিশ্বাসী থাকলেও ম্যাঞ্চেষ্টার ইউনাইটেড আক্রমনাত্মক খেলা খেলতে বদ্ধপরিকর ছিল; ম্যাট বাসবিও এতে বিশ্বাসী ছিলেন। যুদ্ধোত্তর ফুটবলে আজ যাঁরা স্মরণীয় ম্যাট তাদের অন্যতম পুরোধা। অন্ততঃ ম্যানেজাররূপে। আজও তাই বলতে শুনি ম্যাট থাকলে ইউনাইটেড-এর ভয়ের কোন কারণ থাকবে না। এবং এ জন্যই তিনি "গ্রেটেষ্ট অফ দ্য গ্রেটস।"

———

বিশ্বকাপ ফাইন্যাল (১৯৬৬)

লণ্ডন, ৩০শে জুলাই বিশ্বকাপ ফুটবল ফাইন্যালে নাটকীয় সমাপ্তির মধ্যে ইংল্যাণ্ড বিজয়ী হয়। দীর্ঘদিনের উত্তেজনার ইতিহাস শেষ হল। জার্মান গোল করে এগিয়ে ছিল। আবার দ্বিতীয়ার্ধে এক গোলে পিছিয়ে পড়ল। শেষ মিনিটে গোল শোধ দিয়ে ইংল্যাণ্ডের জয়লাভ ছিনিয়ে নিল। কিন্তু অতিরিক্ত সময়ে পেরে উঠল না। ইংল্যাণ্ড আরও দুটি গোল করে ৪-২ গোলে বিজয়ী হয়ে সর্বপ্রথম বিশ্বকাপ ঘরে তুলল।

অতিরিক্ত সময়ে ১০ মিনিটে ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করে একজন সট করলে হার্স্ট সট করেন। হার্স্টের সট ক্রশবারে লেগে মাটিতে পড়ে। বলটি মাটিতে পড়ে গোল লাইন অতিক্রম করেছিল কিনা— এটাই সকলের জিজ্ঞাস্য। খুব কম লোকই জোর গলায় বলতে পারে বলটি গোল লাইন অতিক্রম করেছিল। রেফারি নিজেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন এবং লাইন্সম্যানের সঙ্গে আলাপ করে পরে গোল দেন।

অনেকে মনে করেন ইংল্যাণ্ড ভাগ্যবান—কারণ রেফারি গোল দেওয়ায় ইংল্যাণ্ড এগিয়ে যায় (৩-২)।

এর আগেও রেফারির আরেকটি সিদ্ধান্ত নিয়ে মতানৈক্য দেখা গিয়েছিল, সেই সিদ্ধান্তের জন্য জার্মান দল অতিরিক্ত সময় খেলার সুযোগ পায়। নির্ধারিত সময়ের শেষ মিনিটে জ্যাকি চার্লটনের বিরুদ্ধে ফাউল দেওয়ার কোন কারণ খুঁজে পেলাম না। ফ্রি কিক থেকে হেলার বল পান। বলটি তিনি হাত দিয়ে আয়ত্তে এনেছিলেন বলে মনে হল। হেলার ওয়েবারকে দিলে ওয়েবার গোল শোধ দেন।

বিশ্বকাপ ফাইন্যালে ইংল্যাণ্ডের জয়লাভ খেলার সঠিক ফলাফল। এবং দলগত সংহতির জন্যই ইংল্যাণ্ড বিজয়ী হয়েছে বলতে পারি।

ইংল্যাণ্ড ও জার্মান দলের খেলোয়াড়রা নিজের দেশকে জয়যুক্ত করার জন্য জান-প্রাণ দিয়ে খেলেছেন। ইংল্যাণ্ড জিতেছে মনোবল ও দলগত নৈপুণ্যের জোরে।

এই টুর্নামেণ্ট খেলার আগে অনেকের ধারণা ছিল ব্রাজিলে পেলে, পর্তুগালে ইওসেবিও, স্পেনের সুয়েরেজ, ইটালীর রিভেরার মত খ্যাতনামা খেলোয়াড়দের দলই বিশ্বকাপে প্রাধান্য প্রকাশ করবে। কিন্তু তাদের ধারণা ভেঙে গেছে! কারণ কয়েকটি খেলায় এই সব নামকরা খেলোয়াড়রা নিজেদের প্রতিপত্তি ও সুনাম বজায় রেখেছিলেন। কিন্তু বর্তমানের ফুটবলে ছক বাঁধা খেলা প্রয়োজন। রক্ষণভাগকে সুদৃঢ় করতে হবে। কোন ব্যক্তিগত খেলোয়াড়ের ওপর বিশেষ ভরসা করলে চলবে না। সুন্দর পরিকল্পনার সাহায্যে নামকরা খেলোয়াড়দের আক্রমণের ধার নষ্ট করতে হবে। এই সব বিচার বিবেচনা করে ইংল্যাণ্ডের পরিকল্পনা, পদ্ধতি, দল গঠনের উদ্যম ও খেলোয়াড়দের মধ্যে বোঝাপড়া সত্যই সুন্দর—প্রশংসা না করে থাকা যায় না। আজকের বিজয়ীর জন্য আহত জিমি গ্রিভসের স্থানাধিকারী হার্স্টের তিনটি গোল ও ক্রীড়া প্রতিভার অবদান কম নয়। এছাড়া

ববি চার্লটন যে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের মধ্যে অন্যতম তা তিনি বিশ্বকাপের খেলায় প্রতিপন্ন করেছেন।

জিমি গ্রিভস শক্ত ম্যাচ আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ইংল্যাণ্ডকে জয়লাভ করান। আহত থাকায় তিনি ইংল্যাণ্ড দল থেকে বাদ পড়েন।

পশ্চিম জার্মানীর রক্ষণভাগ চার্লটনের ওপর কড়া নজর রেখেছিল। কিন্তু চার্লটন গোল করার দিকে মন না দিয়ে মাঝ মাঠের খেলায় ইংল্যাণ্ডকে সাহায্য করেন। এছাড়া অধিনায়ক ববিমুর ছিলেন একাধারে আক্রমণ রচনার উৎস ও রক্ষণভাগের অতিরিক্ত সাহায্যকারী খেলোয়াড়।

সবশেষে গোলরক্ষক গর্ডন ব্যাঙ্কস-এর প্রশংসা না করে থাকতে পারলাম না। অন্য খেলায় তাকে বিশেষ কিছু করতে হয়নি। কিন্তু এই ম্যাচে তিনি কয়েকটি নিশ্চিত গোল বাঁচান।

প্রতিক্রিয়া

ওয়েমব্লি স্টেডিয়ামে ৯৩ হাজার দর্শক শুধু প্রবল উত্তেজনা ও উন্মাদনার মধ্যে ইংল্যাণ্ড ও পশ্চিম জার্মানীর বিশ্বকাপের ফাইন্যাল খেলা দেখেছেন তা নয়, ইংল্যাণ্ডের লক্ষ লক্ষ লোক হয় বারে, না হয় নাইট ক্লাবে, না হয় রাস্তায় টেলিভিশনে খেলা দেখেছেন। প্রায় আড়াই ঘণ্টা সারা লণ্ডন শহরে কেন সারা ইংল্যাণ্ডে সমস্ত রকম কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। রাস্তা ঘাটে দর্শকদের টেলিভিশন ও বেতার শোনার হিড়িকে গাড়ি ও ট্যাকসি চলাচল করতে পারনি।

টেলিভিশন যেখানেই ছিল, সেখানেই লোকে লোকারণ্য। দোকানদার জিনিষ বিক্রিই করতে পারেনি। বিভিন্ন পথে ট্রাকে রেডিও থাকায় রাস্তায় লোকে ভিড় করে খেলার বিবরণ শুনেছে। সমস্ত বড় বড় রাস্তায় কোন গাড়ি চলাচল করতে পারেনি। বেলা ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ থাকে।

ইংল্যাণ্ডের বিজয়ের সংবাদ প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত রাস্তাই উল্লাস ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে। বাড়ির ছাদে ও রাস্তায় জাতীয় পতাকায় ভরে যায়। পথে পথে বিশ্বকাপের ব্যাজ বিলি করা হয়। দলে দলে মেয়েরা ফুটবল খেলার গানে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে। এই সময়ের জন্য দেশের সমস্ত লোকেই দুঃখ-দুর্দশার কথা ভুলে যায়।

বিশেষ অতিথি

ওয়েমব্লি স্টেডিয়ামে খেলার সময় রাণী এলিজাবেথ উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া ছিলেন বিশ্ব হেভিওয়েট মুষ্টিযুদ্ধ চ্যামপিয়ন ক্যাসিয়াস ক্লে। বিশ্বকাপ চুরি হলে যে কুকুর কাপ খুঁজে বের করে সেও মাঠে উপস্থিত ছিল।

লণ্ডন শহরে যেমন আনন্দ ও উল্লাস ধ্বনিতে মুখরিত হয় তেমনি জার্মানী ও ল্যাটিন আমেরিকার অন্যান্য শহরে বিষাদের ছায়া নামে। তবে এটা ঠিক, ২৯টি দেশের ৪০ কোটির ওপর লোকে এই খেলা টেলিভিশনে দেখেছে ও ধারা বিবরণী শুনেছে।

বনের এক পেট্রোল বিক্রেতা বলেছে, "এটা আমাদের পরাজয় নয়। নির্দিষ্ট সময় আমরা সমান ছিলাম ২-২ গোলে। এর পরে কে হারলো বা জিতলো তাতে কিছু আসে যায় না।"

পশ্চিম জার্মান সরকারের মধ্যেও ঐ একই মনোভাব প্রকাশ পায়। তারা টেলিগ্রামে জার্মান দলের প্রশংসনীয় খেলার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে জানিয়েছেন যে, প্রত্যেকটি খেলোয়াড়কে রূপোর পাতায় মালা উপহার দেওয়া হবে। ঐটিই হলো ওদেশের খেলায় সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদর্শন ব্যবস্থা।

জার্মানীর সমস্ত রাস্তা জনশূন্য হয়ে পড়ে। কারণ ঐ সময় লক্ষ লক্ষ লোকে পানশালায় ও রেষ্টুরেণ্টে ভীড় করে টেলিভিশনে খেলা দেখে ও যখন জার্মান গোল করে তখনই উল্লাস ধ্বনিতে শহর কাঁপিয়ে তোলে।

আর্জেন্টিনার দর্শকরা সব সময়েই জার্মানদের সমর্থক। বুয়েনস আয়ারসের লোকেরা ইংল্যাণ্ড উন্নততর খেলে জয়ী হয়েছে স্বীকার করেছে।

কলাম্বিয়ার ফুটবল পরিচালকরা ইংল্যাণ্ডের বিজয়ের জন্য ইংলিশ ফুটবল এ্যাসোসিয়েশনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছে। তবে অনেকে বলেছে, পক্ষপাতদুষ্ট রেফারি ইংল্যাণ্ডকে জয়লাভে সাহায্য করেছে।

ইংল্যাণ্ড যে জিতবে এটা ব্রাজিল আশা করেছিল ও সেইজন্য খেলার ফলাফল শুনে ও দেখে বিশেষ আশ্চর্য হয়নি।

রিও ডি জেনেরিওতে দর্শকরা স্কোর বোর্ড টেলিভিশনে দেখে পশ্চিম জার্মান দলকে উৎসাহিত করেছে। ইংল্যাণ্ডের তৃতীয় গোল সম্পর্কে সকলেই সন্দেহ প্রকাশ করেছে। কিন্তু চতুর্থ গোল সম্পর্কে কোন সন্দেহ না থাকলেও সকলে হতাশায় ভেঙে পড়ে।

জার্মান সমর্থকের মাথা ন্যাড়া

ইতালীয় বোলজানোর খবরে প্রকাশ যে, একজন জার্মান বিটনিক তার লম্বা মাথার চুল জার্মান দলের জয়ের জন্য বাজি রাখে—সে জারমান দল হেরে গেলে মাথা কামিয়ে ফেলে ন্যাড়া হয়েছে! অস্ট্রিয়ান সীমান্তে বসে সে টেলিভিশনে খেলা দেখেছিল। যেই খেলা শেষ হয়ে গেল অমনি সেই গ্রামের নাপিতের কাছে গিয়ে তার মাথা কামিয়ে ফেলে।

ফ্রাঙ্কফুর্টের খবরে প্রকাশ, জার্মান দল দেশে ফিরলে দলে দলে লোকে পতাকা নিয়ে চিৎকার ও সঙ্গীত ধ্বনির মধ্যে জার্মানকে প্রচুর ফুলের মালায় ভূষিত করা হয়, তারপর বিরাট মোটরে শোভাযাত্রা করে সহরের বিভিন্ন রাস্তায় পরিভ্রমণ করা হয়। এই সময় হাজার হাজার ছেলেমেয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে 'উই', 'উই' ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে। *

দুই দলের খেলোয়াড়

বিশ্বকাপের (১৯৬৬) ফাইন্যালে উঠেছিল পশ্চিম জার্মানী ও ইংল্যাণ্ড। কিন্তু বিভিন্ন খেলায় প্রতি দলে ২২ জন করে খেলোয়াড় খেলেছিলেন।

ইংল্যাণ্ড: ববিমুর (ক্যাপ্টেন), র‍্যামন উইলসন, জন চার্লটন জেমস আর্মফিল্ড, টেরেন্স পেন ও জিওফ্রে হার্স্ট; ইয়ান ক্যালাযান ও

* আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে।

ও মার্টিন পিটার্স ; জন কনেলী ও জিরাল্ড বার্ণ, জার্মান হাণ্টার ও রোনাল্ড স্প্রিংসেট, জর্জ কোহেন ও ববি চার্লটিন ; এলান বল ও পিটার বোনোট ; রজার হাণ্ট, জর্জ ইস্টহ্যাম, জিমি গ্রিভস, নরি স্টিলেস, গর্ডন ব্যাঙ্কস ও রোনাল্ড ফ্লাওয়ার্স।

পশ্চিম জার্মানী ঃ উইলি স্কুলজ, উলফগ্যাং ওভারাথ, ম্যাক্স লোরেঞ্জ, জারগেন গ্রাবওয়াস্কি, ক্লাউচ ভিটার সিয়েলফ ও লোথার এমারিখ, বার্নণ্ড প্যাজকে ও উলফগ্যাং ওয়েবার, হেনজ হারনিগ ও কার্ল-হেঞ্জ শেলিঞ্জার ; উলফগ্যাং পল ও অ্যালবার্ট ব্রুলস, ব্রাঞ্জ বেঙ্কেন বেয়ার ও হেলমুট হেলার, হর্স্ট হজেস ও গাণ্টার বার্ণার্ড, জোসেফ নেইয়ার, ফ্রিডেল লুজ, হ্যানস টিল কোয়াস্কি, ওয়ের্নার ক্র্যামার উয়ে সিলার (ক্যাপ্টেন) ও সিগি হেল্ড।

বিভিন্ন পর্যায়ে খেলার ফলাফল

(গ্রুপ লীগ)

গ্রুপ—১

ইংল্যাণ্ড—০ উরুগুয়ে—০
ইংল্যাণ্ড—২ ফ্রান্স—০
ইংল্যাণ্ড—২ মেক্সিকো—০
উরুগুয়ে—২ ফ্রান্স—১
উরুগুয়ে—০ মেক্সিকো—০
মেক্সিকো—১ ফ্রান্স—১

	খেঃ	জঃ	ড্রঃ	পঃ	স্বঃ	বিঃ	পয়েন্ট
ইংল্যাণ্ড	৩	২	১	০	৪	০	৫
উরুগুয়ে	৩	১	২	০	২	১	৪
মেক্সিকো	৩	০	২	১	১	৩	২
ফ্রান্স	৩	০	১	২	২	৫	১

গ্রুপ—২

পঃ জার্মানী—৫ সুইজারল্যাণ্ড—০
পঃ জার্মানী—০ আর্জেন্টিনা—০
পঃ জার্মানী—২ স্পেন—১
আর্জেন্টিনা—২ স্পেন—১
আর্জেন্টিনা—২ সুইজারল্যাণ্ড—০
স্পেন—২ সুইজারল্যাণ্ড—১

	খেঃ	জঃ	ড্রঃ	পঃ	স্বঃ	বিঃ	পয়েন্ট
পঃ জার্মানী	৩	২	১	০	৭	১	৫
আর্জেন্টিনা	৩	২	১	০	৪	১	৫
স্পেন	৩	১	০	২	৪	৫	২
সুইজারল্যাণ্ড	৩	০	০	০	১	১	০

গ্রুপ—৩

পর্তুগাল—৩	হাঙ্গেরী—১
পর্তুগাল—৩	বুলগেরিয়া—০
পর্তুগাল—৩	ব্রাজিল—১
হাঙ্গেরী—৩	ব্রাজিল—১
হাঙ্গেরী—৩	বুলগেরিয়া—১
ব্রাজিল—২	বুলগেরিয়া—০

	খেঃ	জঃ	ড্রঃ	পঃ	স্বঃ	বিঃ	পয়েণ্ট
পর্তুগাল	৩	৩	০	০	৯	২	৮
হাঙ্গেরী	৩	২	০	১	৭	৫	৪
ব্রাজিল	৩	১	০	২	৪	৬	২
বুলগেরিয়া	৩	০	০	৩	১	৮	০

গ্রুপ—৪

রাশিয়া—৩	উঃ কোরিয়া—০
রাশিয়া—১	ইটালী—০
রাশিয়া—২	চিলি—১
উঃ কোরিয়া—১	ইটালী—০
উঃ কোরিয়া—১	চিলি—১
ইটালী—২	চিলি—০

	খেঃ	জঃ	ড্রঃ	পঃ	স্বঃ	বিঃ	পয়েণ্ট
রাশিয়া	৩	৩	০	০	৬	১	৬
উঃ কোরিয়া	৩	১	১	১	২	৪	৩
ইটালী	৩	১	০	২	২	২	২
চিলি	৩	০	১	২	২	৫	১

(নক আউট)

কোয়ার্টার ফাইন্যাল

ইংল্যাণ্ড—১	আর্জেন্টিনা—০
রাশিয়া—২	হাঙ্গেরী—১
পর্তুগাল—৫	উত্তর কোরিয়া—৩
পশ্চিম জার্মানী—৪	উরুগুয়ে—০

সেমি ফাইন্যাল

পশ্চিম জার্মানী—২	রাশিয়া—১
ইংল্যাণ্ড—২	পর্তুগাল—১

পরাজিত সেমিফাইনালিষ্ট

পর্তুগাল—২	রাশিয়া—১

ফাইন্যাল

ইংল্যাণ্ড—৪	পশ্চিম জার্মানী—২

বিশ্বকাপের আয়-ব্যয়

লণ্ডনে ১৯৬৬-র বিশ্বকাপে মোট আয় হয়েছিল ৪ কোটি ২৭ লক্ষ ২৬ হাজার ৪৯৫ টাকা, বিশ্বকাপের মূল খেলার ৩২টি ম্যাচে দর্শকের সংখ্যা ছিল ১৫ লক্ষ ১৪ হাজার ৬৭৭ জন, খেলানোর জন্য উদ্যোক্তারা খরচ করেন ১ কোটি, ২৬ লক্ষ ৪২ হাজার ৬৫ টাকা, তাঁদের লাভ হয় ২ কোটি, ৯৯ লক্ষ ৮৪ হাজার ৪৩০ টাকা। এই খেলার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন ইংলিশ ফুটবল এ্যাসোসিয়েশন। তাদের ব্যয় হয়েছিল ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা।

বিশ্বকাপের নিয়ম বদল !

১৯৭০-এ মেক্সিকোয় অনুষ্ঠিতব্য বিশ্বকাপের খেলায় কিছু কিছু নিয়ম বদল হবে বলে ঠিক হয়েছে। কোন দলের গোলরক্ষক এবং আরেকজন খেলোয়াড় আহত হলে তাদের বদলে অন্য প্লেয়ার নামানো চলবে।

আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশনের কর্মসচিব ডঃ হেলমুট কাটজার জানিয়েছেন 'আহত' সংজ্ঞাটি তুলে দেওয়ার অনুকূলে আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়ণ সংস্থার কাছে সুপারিশ করা হয়েছে।

এতদিন বিশ্বকাপে বদলী খেলোয়াড় নামাবার বিধান ছিল না। মেক্সিকোতে চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা সুরু হবে ঐ বছর ৩১শে মে। সাধারণতঃ এই খেলাগুলি এক সপ্তাহ আগে আরম্ভ হয়। কিন্তু ইওরোপীয় ফুটবল সংস্থাগুলির পক্ষ থেকে খেলোয়াড়দের মেক্সিকোর আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য সময় পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রে পেশাদারী ফুটবল চালু না হতেই জোট ভাঙ্গাভাঙ্গির সমস্যা দেখা দিয়েছে।

ফিফা'র সভাপতি স্যার স্ট্যানলী রাউজ এ ব্যাপারে বোঝাপড়ায় সাহায্যের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ফুটবল সংগঠনের সভাপতি কেন ম্যাকরের কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছেন। ঐ সংস্থা এখনও ফিফার অনুমোদন পায়নি। যে সকল সমস্যা নিয়ে স্যার স্ট্যানলী মিঃ ম্যাকরের সঙ্গে আলোচনা করবেন, তারমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে খেলা শেষ হওয়ার পর শেষ বাঁশির সঙ্গে টেক্সাসি কায়দায় গুলি ছোঁড়ার অভ্যাস বন্ধ করতে হবে।

বিশ্বকাপ চোরের জেল

লণ্ডনের ডক-কর্মী এডওয়ার্ড বেচ্‌লেজে-র বিশ্বকাগ চুরির অভেযোগে দু বছরের জেল হয়েছে। সে কোর্টে বলে—"আমি কাপ চুরি করিনি। আমি ফুটবল এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জো মিয়ারসকে ফোনে জানিয়েছিলাম ১৫,০০০ পাউণ্ড দিলে কাপ ফেরৎ দিতে পারি।"

প্রকৃতপক্ষে দি পোলাক নামে একজন ঐ কাপটি চুরি করেছিল। কাপটি পেয়েছিল ডকের আরকজন কর্মী—ডেভিড কোর্বেট। তার কুকুরই কাপটি খুঁজে পায়। কোর্বেটকে চারহাজার পাউণ্ড পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

[বিশ্বকাপের খেলা শুরু হয়েছিল ১১ই জুলাই। এ খবরটি ৯ই জুলাইয়ের। খবরটি রয়টার পরিবেশিত]

খেলোয়াড়দের ধূম্রপান ও সুরাপান নিষেধ

উত্তর কোরিয়া সর্বপ্রথম ১৯৬৬-তে বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। তারা মাসের পর মাস ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে। দুবছর তারা কঠিন সংযমের মধ্যে দিন কাটিয়েছে। এই সময়ে কেউ ধূম্রপান করেনি। সুরা স্পর্শ করেনি। প্রথম রাত্রে শুতে গিয়েছে। শেষ রাত্রে উঠে সোজা গিয়েছে মাঠে। সেখানে গিয়ে অনুশীলন। তার ফাঁকে এক ঘন্টা বিশ্রাম ও তখনই প্রার্থনা।

সকল খেলোয়াড়কে সৈনিকদের সঙ্গে অনুশীলন করানো হয়েছিল।

পেলের ক্ষতিপূরণ

বিশ্বকাপে সকল খেলোয়াড়ের মধ্যে ব্রাজিলের খেলোয়াড় পেলের কোনরূপ আঘাতের জন্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে সাড়ে বাহান্ন লক্ষ টাকা ইনসিওর করা হয়েছিল।

বিশেষ অতিথি

১১ই জুলাই ওয়েমব্লি স্টেডিয়ামে বর্ণাঢ্য পরিবেশে বিশ্বকাপের উদ্বোধন করেন রাণী এলিজাবেথ। ওদিনকার বিশেষ অতিথিদের গ্যালারীতে উপস্থিত ছিল একটি কুকুর। তার প্রভু ডেভিড কোরবেট তাকে বেশী দামের সীটে বসে খেলা দেখিয়েছেন। এই কুকুরটিই চুরি যাওয়া বিশ্বকাপ খুঁজে বের করেছিল।

আত্মহত্যার চেষ্টা

ব্রাজিলের পরাজয়ের সংবাদে ১৯ বছরের ছাত্রী জাহাজ থেকে সমুদ্রে লাফিয়ে পড়ে। জনৈক নাবিক তাকে উদ্ধার করেন। ব্রাজিলের এই ছাত্রীটিকে জল থেকে তোলা হলে চেঁচিয়ে বলতে থাকে "আমি পেলেকে ঘৃণা করি।"

দু'জনের মৃত্যু

মেক্সিকো ও উরুগুয়ের খেলা টেলিভিশনে দেখতে দেখতে উত্তেজনায় একজন আরেকজনকে ছুরি মারায় দ্বিতীয় লোকটি মারা গিয়েছে।

আরেকটি ঘটনা ঘটে একটি নির্ময়মান বাড়িতে। রাজমিস্ত্রী জানালার কাজ করছিল। খেলার খবর শুনে সে দোতালা থেকে নিচে পড়ে মারা যায়।

জরিমানা

ফিফা আর্জেন্টিনা ফুটবল এ্যাসোসিয়েশনকে এক হাজার সুইস ফ্রাঙ্ক জরিমানা করেছিল। ১৯৭০-এর বিশ্বকাপে খেলতে দেওয়া হবে না বলেও সাবধান করে দেওয়া হয়। কারণ বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইন্যালের সময় ইংল্যাণ্ড ও আর্জেন্টিনার খেলায় অধিনায়ক র‍্যাট্টিনকে মাঠ থেকে বের করে দিলে তার দলের খেলোয়াড়রাও বেরিয়ে যায়। এবং এজন্য সাত মিনিটের জন্য খেলা বন্ধ থাকে। পুলিশ পাহারায় রেফারীকে মাঠ থেকে নিয়ে যাওয়া হয়।

আর্জেন্টিনার ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি ডঃ বেথি বলেছেন, আর্জেন্টিনা ও উরুগুয়ে ফিফার সদস্যপদ ছেড়ে দেবেন কিনা তাই চিন্তা করছেন।

রয়টারের খবরে প্রকাশ, ল্যাটিন আমেরিকান পরিচালকদের ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে এই রকম সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথাই ভাবেন।

"খেলোয়াড় হতে গেলে……"

[এই নিবন্ধে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড এর 'স্টার মেকার' ম্যাট বাসবি ও ইংল্যাণ্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক জিমি আর্মফিল্ডের আলোচনা লিপিবদ্ধ করলাম—লেখক]

আর্মফিল্ড: তরুণদের মধ্য থেকে তুমি কিভাবে খেলোয়াড় বাছবে ?

বাসবি: আমার ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড-এর কথাই বলি। ওখানে আমরা কয়েশ' তরুণকে নিয়েছি। প্রতিবছরই এভাবে নিই।

প্রথমে আমি দেখি ওরা কতটা শক্ত ও সমর্থ। ১৫ বছরের একটি ছেলে ভালভাবে বল কণ্ট্রোল করবে, ঠিকভাবে পাসও দেবে। অর্থাৎ ফুটবল সম্পর্কে তার মৌলিক জ্ঞান থাকবে। একমাত্র যারা পুঁচকে ছেলে—তাদের মধ্যে এসব আশা করা ভুল হবে। আমি হৃষ্টপুষ্ট চেহারার দিকেও নজর রাখি। ফুটবলের মত কঠিন শ্রমের ট্রেনিং-এ স্বাস্থ্য অবশ্যই চাই। আমার ছেলেদের সকলেই স্কুলের ছাত্র, এবং ওরা নিজেদের গণ্ডীতে একএকজন অপ্রতিদ্বন্দ্বীও। ঐ বয়সে খুব বেশি টুর্ণামেন্ট না খেললেও দু একটা যা খেলবে তাই-ই ভাল করে লক্ষ্য করতে হবে। দেখবো ওদের প্রতিভা।

আর্মফিল্ড ঃ একজন ম্যানেজার কিভাবে একটি ছেলেকে সাহায্য করতে পারে ?

বাসবিঃ একটি উদীয়মান ছেলে দু'বছরের মধ্যে তার কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারে। এবং ১৭ বছরের মধ্যে পুরোপুরি পেশাদার হতে পারে। অবশ্য কঠিন পরিশ্রম করতে হবে। এজন্য তাকে উৎসাহ দিতে হবে। তবে এই দু'বছর তাকে শুধু খেললেই চলবে না। স্কুলের পড়াও করতে হবে। কারণ সে যদি ফুটবলে তেমন প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব না দেখাতে পারে, তবে অন্য রোজগারের পথ দেখতে হবে।

আর্মফিল্ড ঃ অনেক ছেলে পিছিয়ে যায় কেন ? পারে না কেন ?

বাসবি ঃ আমি আনন্দিত যে খুব কম ছেলেই ফিরে যায়। কোন ছেলে যদি ধৈর্যধরে ফুটবল নিয়ে আঁকড়ে থাকে তাহলে তার উন্নতি হবেই। অবশ্য ছোটদের অনেক বাধা আসতে পারে, আসেও, তবে প্রত্যেক ছেলে তার উন্নতির শীর্ষে না ওঠা পর্যন্ত সাধনায় নিষ্ঠাবান থাকবে। আনন্দের কথা এরা বাইরের দিকে নজর দেয় না। তার স্বভাব ও চরিত্রে যদি ফুটবল গেঁথে যায় তাহলে এতে সে উন্নতি করবেই।

আর্মফিল্ড ঃ যারা দরিদ্র, ছোট বেলাতেই রুটির সন্ধানে ঘর ছাড়া, তারা কি করে ফুটবলে উন্নতি করবে ?

বাসবি ঃ এতেও কোন অসুবিধে নেই। আমাদের ক্লাবে এলে সে তার দারিদ্র্যের কথা ভুলে যাবে।

আর্মফিল্ড ঃ প্রফেশনাল ফুটবলার হতে গেলে এই ছেলেরা কি করবে ?

বাসবি ঃ কোন কাজই আধাআধি করা উচিত নয়। যে ছেলে তার শিক্ষানবিশী সমাপ্ত করবে, যখন ভাববে সে আর স্কুলের ছাত্র নয়, সে অবশ্যই চাকরির সন্ধান করবে। ফুটবলেও তাই। ক্লাব গুলোর উচিত এদের উৎসাহ দেওয়া, অবশ্য সেই একথা স্মরণীয়, নিষ্ঠার সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে। কোনরকম ফাঁকি নয় কিন্তু। ক্লাবের ওপর প্লেয়াররা যেমন বিশ্বাস রাখবে। তেমনি ওরাও এদের ওপর আস্থাশীল হবেন।

জিমি আর্মফিল্ড 'খেলোয়াড় হওয়া' প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ পেশাদার ফুটবলার হওয়াই সকলের উদ্দেশ্য থাকা উচিত। তার যেমন 'ন্যাচরাল এবিলিটি' থাকবে, তেমনি বলের জ্ঞান। খেলার সুরু দেখেই আঁচ করে নিতে হবে—বিপক্ষ দলের খেলার গতি।

সবচেয়ে বড় কথা—প্রত্যেক খেলোয়াড়ের দৌড়ে পারদর্শী হতেই হবে। খেলার গতি এখন দ্রুত। পৃথিবীর সর্বত্র এই অবস্থা। রক্ষণভাগ বা আক্রমণভাগ-সকলকে এই বিষয়ে নজর দেওয়া উচিত।

প্রত্যেক ছেলেকেই উচ্চাকাঙ্খী হওয়া উচিত। তারপর 'গৌরব'। দলের হয়ে প্রত্যেকে গৌরবান্বিত হবে। নিরাপত্তারও প্রয়োজন। ফুটবলের সঙ্গে এরা অন্য কিছু করুক এ আমি চাই না। এতে ট্রেনিং ব্যাহত হবে। সর্বক্ষণের জন্য ফুটবলে আত্মনিয়োগ করতে হবে। 'ফুটবলও জীবিকা নির্বাহের পথ' এ ধারণা হওয়া উচিত একথা না বলে, এর ব্যবস্থা করতে হবে।

নিজেকে তৈরীর জন্য সব রকম সুযোগ গ্রহণ করতে হবে। অবশ্য তাতেও যদি সম্ভব না হয় তাহলে 'দুর্ভাগ্য' ছাড়া আর কিছু বলা যাবে না। আমার বিশ্বাস ঃ এমন ঘটনা ঘটেনা।

মেক্সিকোর পথে

বিশ্বকাপের খেলা হবে ১৯৭০-এ মেক্সিকোয়। গত বছর ইংল্যাণ্ডে ফাইন্যালের পরই মেক্সিকোর নাম ঘোষণা করা হয়। তারপর থেকেই প্রস্তুতি চলছে ওদেশে। প্রস্তুতি অন্যদেশেও। অবশ্য তারা শুধু টীম তৈরীর জন্য।

১৯৭০-এ বিশ্বকাপের আগে ১৯৬৮-তে ওদেশে হবে ওলিম্পিক। টোকিওর (১৯৬৪) পর ওলিম্পিকের জন্যও ওই দেশের নাম উঠেছিল। সুতরাং মেক্সিকোবাসীরা গর্বিত। অবশ্য এজন্য তাঁদের ওপর অনেক দায়িত্ব বর্তেছে!

ওলিম্পিকের সময় যদি কোন দোষত্রুটি থাকে স্বভাবতই দুবছরের মধ্যে তার সংশোধন হবে। সুতরাং ওখানে বিশ্বকাপের খেলার আয়োজনে কোন ত্রুটি থাকবে না—এ ধারণাই স্বাভাবিক।

অনেকের ভয়—মেক্সিকোয় খেলতে অসুবিধা হবে। ফিফার প্রেসিডেণ্ট স্যার স্ট্যানলি রাউজ চিন্ত অভয়বাণী দিয়েছেন—সাড়ে সাতহাজার ফুট উঁচুতে হলেও কোন অসুবিধা হবে না। অবশ্য এফ. এ-র সেক্রেটারী মিঃ ডেনিস তার সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। ইংল্যাণ্ড ভোট দিয়েছিল আর্জেন্টিনায় পরবর্তী বিশ্বকাপ খেলার জন্য।

ব্রিটিশ সাংবাদিকরাও একমত হতে পারেন নি। কিন্তু স্যার স্ট্যানলির ব্যাখ্যার পর তাঁরা আর 'রা' করেন নি। ইংল্যাণ্ডের প্রাক্তন ম্যানেজার ওয়াটার উইনটারবটম স্ট্যানলিকে সমর্থন করতে পারেন নি। অত উঁচুতে খেলায় আমরা পারদর্শী নই। দমে কুলোবে না। ১৯৫৮-য় তাই আমরা মেক্সিকো সিটিতে মেক্সিকোর সঙ্গে ২-১ গোলে হেরেছিলাম। অথচ তিনবছর পরে মেক্সিকো ওয়েমব্লিতে ৮-০ গোলে ইংল্যাণ্ডের কাছে হেরে যায়। শেফিল্ড ইউনাইটেড-এর কর্মকর্তারাও

মিঃ ওয়ালটারের সঙ্গে একমত। ইংলিশ ক্লাব ওখানে গিয়ে ১-০ গোলে হেরেছিল। কারণ, "ঐ আবহাওয়াকে আমাদের খেলোয়াড়রা মানিয়ে নিতে পারেনি।" অবশ্য সপ্তাহকাল থাকার পর শেফিল্ড ইউনাইটেড অবশ্য উন্নতি করেছিল। এক মাস অবস্থানের পর টটেনহাম হসপার ভাল রেজাল্ট করেছিল। হারিয়েছিল মেক্সিকোকেই।

ইংল্যাণ্ডে মেক্সিকোকে নিয়ে যতই বাদানুবাদ হোক না কেন বর্তমানের ইংল্যাণ্ড দলের ম্যানেজার অ্যালফ্রেড র্যামসী কিন্তু অত ভাবিত নন। তিনি বলেছেন: বিশ্বকাপ সুরুর আগে একবার টীম নিয়ে মেক্সিকো ঘুরে এলেই সব চুকে যাবে।

অন্যান্য দেশেও এ নিয়ে চিন্তার অন্ত নেই। কেউ নতুন খেলোয়াড় খুঁজে বেড়াচ্ছেন। কেউ বা নতুন ট্যাকটিকস উদ্ভাবনে ব্যস্ত। ১৯৬২-তে বিশ্বকাপের (চিলি) পর ইংল্যাণ্ড যেমন তৎপর হয়েছিল, তেমনি এবার স্কটল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড এবং ওয়েলসও সুরু করেছে। ব্রাজিল তো কবেই অনুশীলন আরম্ভ করেছে। আরম্ভ করেছে মেক্সিকোর মত অত উঁচু জায়গায়। রাশিয়া, পশ্চিম জার্মানী, আর্জেন্টিনা, ঘানা এমন কি দূরপ্রাচ্যের দেশগুলিও। গতবার যেমন উত্তর কোরিয়া এসেছিল, তেমনি আগামী বিশ্বকাপে অনেক নতুন দেশকে দেখা যেতে পারে। নতুন নিয়মে চূড়ান্ত পর্যায়ের ষোলটি টীমের অন্যতম হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা আফ্রিকার একটি দলের।

স্পেন, ইটালী, গ্রীস, তুরস্ক এবং আলবানিয়ার মত আলজিরিয়া, ঘানা, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র এবং নাইজিরিয়াকেও একই গ্রুপে দেখা যেতে পারে।

তবে একথা ভাবা অমূলক নয় যে, গতবার যেমন ইংল্যাণ্ডের পক্ষে স্বদেশের মাটিতে খেলা অনেক অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিল বিজয়ী হওয়ার জন্য, তেমনি সুযোগ মেক্সিকোরও হতে পারে।

তাছাড়া ১৯৬৮-তে ওলিম্পিকের সময় নিজেদের দলের মূল্যায়ণও সম্ভব হবে। সাড়ে সাত হাজার ফুট বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে সমুদ্র থেকে মেক্সিকো সিটির উচ্চতা ৭,৪৫৯ ফুট। ব্রিটেনের ছুটো বেন নেভিস পাহাড়কে বসালে যত উঁচু হবে, প্রায় তেমনি।

শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট ও আরও বিভিন্ন কারণ দেখানো হলেও মেক্সিকো দলের প্রধান ইগন্যাসিও ট্রেলেস—(যিনি ১৯৬৬-তে ওয়েমব্লিতে ছিলেন) বলেছেন, মেক্সিকো সিটির উচ্চতা নিয়ে যারা কথা বলেন—তারা জিতলে ওকথা মুখে আনেন না। ওসব হারার পরের অজুহাত।

পেলেও মেক্সিকো সিটিসহ অন্যত্র খেলেছেন। খেলেছেন ব্রাজিলের মত স্বাভাবিকভাবেই। অবশ্য পেলে ইজ পেলে। হি ক্যান প্লে ফুটবল। অন্যান্য জায়গার মত এখানেও যদি তিনি একইভাবে খেলতে পারেন, তাহলে অন্যের অসুবিধে কোথায়? অবশ্য আনকোরাদের একটু অসুবিধে হতে পারে। তবে সপ্তাহখানেক ঐ উচ্চতায় অনুশীলন করলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

প্রতিটি ড্রেসিং রুমে অক্সিজেনের ব্যবস্থা আছে। অবশ্য এটা শুচিবায়ু গ্রস্তদের জন্য। স্থানীয় খেলোয়াড়রা কেউ ঐ আক্সিজেন ব্যবহার করেন না। অনেক আগন্তুক দলও নয়।

সম্প্রতি মেক্সিকোয় ছুটি ক্লাবের মধ্যে একটি টুর্নামেণ্ট হয়ে গিয়েছে। অংশ নিয়েছিল মেক্সিকোর তিনটি, ছুটি ব্রাজিলের। বাকিটি হল মস্কো ডায়নামো। বিজয়ী হয়েছিল ডায়নামো। মস্কোর সঙ্গে তারা মেক্সিকোর কোন ফারাক অনুভব করেন নি।

শেফিল্ড ইউনাইটেড-এর ম্যানেজার জন হ্যারিস গত গ্রীষ্মে মেক্সিকো সফরকালে বলেছিলেন, প্রথম ম্যাচে তাদের কিছুটা অসুবিধে হয়েছিল। কিন্তু ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে প্লেয়াররা সব মানিয়ে নিয়েছিল।

বিশ্বকাপের খেলা মেক্সিকোর চারটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকবে। মেক্সিকো সিটি, গুয়াদালাজারা, মণ্টেরী ও লিঁয়-তে।

প্রধান খেলাগুলো হবে ষাট লক্ষ লোকসংখ্যার সহর মেক্সিকো সিটির অ্যাজটেক স্টেডিয়ামে। হোম গ্রুপ, কোয়ার্টার ফাইন্যাল, সেমিফাইন্যাল, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানাধিকারী এবং ফাইন্যাল খেলা হবে এই স্টেডিয়ামে। সর্বাধুনিক ব্যবস্থা সম্মত এই স্টেডিয়ামের জন্য ব্যয় হয়েছে ৪২, ৫০,০০০ পাউণ্ড। এবং বেশির ভাগ অর্থ দিয়েছেন একজন ব্যবসায়ী। ওখানে আসন সংখ্যা একলক্ষ পাঁচ হাজার। আসনগুলো চারটি ধাপে বিভক্ত। ৪৫০টি ডি-লাক্স প্রাইভেট বক্স। বক্স প্রতি দর্শনী লাগবে আড়াই হাজার পাউণ্ড। অবশ্য প্রতি বক্সে দশটি করে আসন আছে। এছাড়া বার, স্নানের ঘর, দু'খানা করে গাড়ি রাখার জায়গা।

স্টেডিয়ামে পৃথক উপাসনা স্থান, হাসপাতাল এবং জিমন্যাসিয়ামও আছে। সংবাদপত্র, রেডিও এবং টেলিভিশনের জন্যও উত্তম ব্যবস্থা।

অর্থাৎ বিশ্বকাপ খেলার সকল আয়োজন ইতিমধ্যেই সমাপ্ত। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—১৯৭০-এ কারা বিশ্ব-সেরা হবে? ১৯৬৬-তে যাঁরা খেলেছেন তাঁদের কে কে-ই বা মেক্সিকোয় যোগ দিতে পারবেন?
